কাঠিয়া বাবা

শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯৩০

প্রকাশক
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এস্-সি.
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

কুন্তলীন প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রিণ্টার—শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস

উৎসর্গ পত্র

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ (১০৮) স্বামী সন্তদাস বাবাজী
ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজের শ্রীচরণকমলে এই
ক্ষুদ্র পুস্তক একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত
অর্পণ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা
করিলাম; কারণ, তাঁহারই
শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী ও গ্রন্থ
অবলম্বনে এই পুস্তক
লিখিত

সেবকাধম
শ্রীশিশিরকুমার রাহা

নিবেদন

ভারতের এই জাগরণের দিনে বালকদের চরিত্র গঠনের চেষ্টাই দেশের ও দশের প্রকৃত মঙ্গল। আজ যাহারা ছোট, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ বিধাতৃ, কাজেই মহাপুরুষের চরিত্রের আদর্শ তাহাদের জীবনকে সুস্থ, সবল ও মধুময় করিয়া তুলিবে, এই আশায় “কাঠিয়া বাবা”র জীবন-কথা দেশের ছোট ভাই বোনদের নিকট উপস্থিত করিলাম।

বাগবাজার, ২ নং দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্ নিবাসী আমাদের অন্যতম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয়ের উৎসাহ ও সম্পূর্ণ অর্থসাহায্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। শিক্ষক তিনি, ছোট ছেলেদের লইয়া বহুদিন যাবৎ দিন কাটাইতেছেন, কাজেই যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া এই পুস্তক প্রকাশে তিনি প্রধান সহায়, অবশেষে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছা ফলপ্রসূ হউক এই প্রার্থনা করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ শ্রীবৃন্দাবনস্থিত নিম্বার্ক-আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর সেবার্থে ব্যয়িত হইবে।

নিম্বার্ক আশ্রম
শ্রীবৃন্দাবন
২০.৮.৩৬

শ্রীশিশিরকুমার রাহা

কাঠিয়া বাবা

এক

কবি জন্মভূমির বন্দনা গাহিতে যাইয়া কি সুন্দর, কি মধুর, কি পবিত্র, পুণ্যগাঁথাই না গাহিয়াছেন! বাস্তবিকই ত যে দেশ এমন সুন্দর, যে দেশ এমন মধুর, যে দেশ এমন পবিত্র, যে দেশ এমন পুণ্যভূমি, তাঁর মহিমার বাণী বন্দনা-গীতি এমনটি না হইয়া উপায় কি? চল,—আজ আমরাও কবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলি:—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী!

তার আবার,—

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী!

শুধু কি তাই ?—সেথায়,—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী !

তাই তো—

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষ-স্তন্যবাহিনী !

এই পবিত্রভূমি ভারতভূমি আমাদের জন্মভূমি, দেবতাদেরও বুঝি এ প্রিয়ভূমি। কত যোগী, কত মুনি, কত ঋষি যুগ যুগান্তর হইতে এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ যাঁহার পুণ্য-কাহিনী তোমাদের বলিব তিনিও তাঁহাদেরই একজন। তোমাদের মত ছোট্ট মানুষটি তিনি, সাধন-বলে একদিন কত বড় হইয়াছিলেন সে কথা আজ তোমরা শুনিবে—শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

পঞ্চনদ-বিধৌত পাঞ্জাবের নাম তোমরা শুনিয়াছ। তাহার একটি প্রধান নগর—অমৃতসহর। এই অমৃত-সহরের ৪০ মাইল দূরে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, নাম

তাহার লোনা চামারি। এই লোনা চামারির নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিত। তাহাদের অবস্থা মন্দ ছিল না। এই পরিবারে এক বালক জন্মগ্রহণ করে—তাহার নাম রামদাস। রামদাসের মাতা তাঁহার অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা রামদাসকেই অধিক ভালবাসিতেন। বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে তিনি তাহাদের বড় আদর যত্ন করিতেন। মায়ের এই গুণ রামদাসও পাইয়াছিল; আর তাই ত রামদাসও একদিন সাধু অতিথির সেবা করিতে যাইয়াই এমন বর লাভ করিলেন যাতে মানুষ তিনি দেবতা হইলেন। সে কিরূপ পরে বলিতেছি।

রামদাসের বাড়ীর নিকটে এক সাধু বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিত। প্রতিদিন বহু লোক ঐ পরমহংসজীকে দর্শন করিতে যাইত। রামদাসও সেখানে যাইত। পরমহংসজী তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। রামদাস তখনো ছোট্টটি—সবে মাত্র চার বৎসর তার বয়স। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? বালক হইলেও রামদাস বুদ্ধিমান ছিল। সাধুর নিকট বসিয়া বসিয়া বালক দেখিল—ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ঐ সাধুর পায় মাথা লুটায়। ইহা দেখিয়া তাহার মনে হইল, "সাধুটির এমন কি গুণ আছে যাতে সকলেই তাঁকে সম্মান করে—সকলেই

তাঁকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে!" বালক তাহার মনের এই কৌতূহল নিবারণের জন্য একদিন পরমহংসজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এ দুনিয়াতে আপনিই সকলের চেয়ে বড়, কারণ সকলেই এসে আপনার পায়ে মাথা নোওয়ায়, কি ক'রে আপনি এত বড় হ'লেন?" পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন, "বাছা, আমি রাম নাম জপ ক'রেই এত বড় হ'য়েছি; রাম নাম কর, তুমিও কালে বড় হ'তে পার্বে।" এই কথা শুনিয়া রামদাসের বড় হ'বার আগ্রহ জন্মিল, তদবধি বালক রাম নাম জপ করিতে লাগিল।

রামদাস আরও একটু বড় হইয়াছে—বয়স তাহার সাত বছর। একদিন বাড়ীর নিকট মাঠে মহিষ চরাইতেছিল, এমন সময় তথায় এক সাধু আসিয়া উপস্থিত,—সাধুটির অপরূপ রূপ। তিনি রামদাসের নিকট কিছু খাবার চাহিলেন। বালক তাঁহাকে তাহার মহিষগুলি দেখিতে বলিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। রামদাসের পিতামাতা তখন দুপুরের আহার শেষ করিয়া নিদ্রায় মগ্ন, বালক তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গাইল না, নিজেই ভাণ্ডার ঘরে ঢুকিয়া ঘি, আটা, চিনি প্রভৃতি লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইল। সাধু আহ্লাদের সহিত ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বাছা, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি যোগীরাজ হ'বে।" কথা

শুনিয়া বালক বলিল, "সে কি? আমার বাড়ীঘর, বাপ-মা সকলেই আছেন, তা ছাড়া আমি প্রতিদিন পাঁচ সের ক'রে দুধ খাই।" সাধু বলিলেন, "তা হোক্, আমার কথা কখনও মিথ্যে হয় না, তুমি যোগীরাজ হবে ঠিকই।" এই বলিয়া সাধু কোথায় সরিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। আর এক মজা হইল, সাধুর ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই রামদাসের পিতা-মাতা, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতি যে টান ছিল তাহা লোপ পাইল। যাহা হউক, বালক এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিল না।

আজকাল লেখাপড়া শিখিতে হইলে আমরা স্কুল কলেজে যাই; পূর্ব্বকালে কিন্তু ঠিক অমনটি ছিল না। তখনকার দিনে বিদ্যালাভ করিতে হইলে গুরুগৃহে যাইতে হইত, গুরুর পরিবারে বাস করিয়া তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। রামদাসের পিতা তাই রামদাসের উপনয়ন দিয়া ভিন্ন গ্রামে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামদাস খুব বুদ্ধিমান্ ছেলে, দেখিতে দেখিতে রামদাস গুরুর খুব প্রিয় হইয়া উঠিল, অন্যান্য ছাত্রেরা এবং তাহার গুরুপুত্র ইহা সহিতে পারিল না, ঈর্ষায় তাহাদের মন জ্বলিতে লাগিল। কি করিয়া রামদাসকে জব্দ করা যায় এই হইল এখন তাহাদের ভাবনা। সুযোগও

মিলিল। রামদাসের দৈনিক পাঠ অতি সহজেই হইয়া যাইত, তৎপর বালক অপর বালকের ন্যায় খেলায় সময় নষ্ট না করিয়া মালা হাতে রাম নাম জপ করিত। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একদিন গুরুপুত্র ও অন্যান্য ছাত্রেরা গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "গুরুদেব! আপনি রামদাসকে খুব ভালবাসেন ও ভাল বলেন, কিন্তু সে মোটেই লেখাপড়া করে না, সর্ব্বদাই মালা টপ্‌কায়।" এই কথা শুনিয়া গুরুজী রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি হে, তুমি পড়াশুনা কর না কেন? ছেলেরা বল্‌চে তুমি নাকি সারাদিনই মালা টপ্‌কাও।" রামদাস যোড়হাতে বলিল, "না, মহারাজ, একথা সত্য নহে, আমি রীতিমত আমার পড়া শিখে মালা জপ করি।" গুরুজী তখন রামদাসকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন রামদাসের কথাই সত্য। তখন অন্যান্য বালকদের কি অবস্থা হইল তাহা ত বুঝিতেই পার। এই ঘটনা রামদাসের পক্ষে শাপে বর হইল। গুরুজী তখন হইতে রামদাসকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন। গুরুর ভালবাসায় রামদাসের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। রামদাস আট নয় বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া ব্যাকরণ (সারস্বত), জ্যোতিষ, স্মৃতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিলেন। গীতাপাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া

রামদাসের যেন নূতন জীবন আরম্ভ হইল। কি অপূর্ব্ব সে গ্রন্থ! রামদাসের সমস্ত মন এই গ্রন্থ অধিকার করিয়া বসিল; আর তাহা ত হইবেই।—উহা ত যে সে গ্রন্থ নয়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখা ও শিষ্য বীরবর অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে লিখিত। গীতাপাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুজী রামদাসকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

দুই

রামদাস গৃহে ফিরিলেন। এখন তিনি বড় হইয়াছেন, লেখাপড়া শিখিয়াছেন; কাজেই পিতামাতা তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। রামদাসের কিন্তু সে ইচ্ছা নয়, তিনি রামনাম জপ করিয়া বড় হইবেন, সাধু হইবেন। ছোট বেলা পরমহংসজীর নিকট যে একথা শুনিয়াছিলেন তাহা আজিও ভুলিয়া যান নাই। তাই কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না। তখন পিতামাতা রামদাসের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের অন্যান্য ছেলেদের বিবাহ দিলেন।

রামদাসের উপনয়ন হইয়াছে তাহা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করেন। কথিত আছে, এই মন্ত্র সওয়া লক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। রামদাস ঐ মন্ত্রে সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার বাটীর নিকটে এক বটবৃক্ষ ছিল। তিনি ঐরূপ ইচ্ছা করিয়া ঐ বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! এক লক্ষ জপ শেষ হইবামাত্র তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। কে যেন আকাশ হইতে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "বৎস, বাকী পঁচিশ হাজার

জপ এখানে না ক'রে জ্বালামুখী যেয়ে কর, তা'হলেই আমি সিদ্ধ হব।" ঐ কথা শুনিয়া রামদাস জ্বালামুখী যাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার এক ভাইপো ছিল, দু'জনের মধ্যে খুব ভাব—সেও রামদাসের সঙ্গী হইল। রামদাসের জন্মস্থান হইতে জ্বালামুখী প্রায় ৭০।৮০ মাইল। যাহা হউক, তাঁহারা দীর্ঘপথের ভয়ে ভীত না হইয়া জ্বালামুখী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তাঁহারাও পথ চলিতেছেন; ইতিমধ্যে একদিন তাঁহারা এক সাধু দেখিতে পাইলেন। সাধুটির বৃহৎ জটাজাল, উজ্জ্বল দেহকান্তি—কি সুন্দর, কি মনোরমই দেখাইতেছিল! ঐ রূপে রামদাস মুগ্ধ হইলেন। শুধু কি তাই! ঐ সাধুজী কি শক্তিবলে রামদাসকে তাঁহার দিকে টানিতেছিলেন, ফলে রামদাসের জ্বালামুখী যাইবার ইচ্ছা লোপ পাইল। তিনি তখন সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ-কুমার। আমার একান্ত ইচ্ছা আমি আপনার চেলা হই। আপনি আমাকে কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।" সাধুটি রামদাসের সরল ব্যবহারে খুসী হইয়া বলিলেন, "হাঁ বাচ্চা, তুমি এখানে থাক, তোমাকে চেলা কর্‌ব।" সেই দিনই শুভ মুহূর্ত্তে রামদাস মুণ্ডিত মস্তকে গুরু-কৃপা লাভ করিলেন। তাঁহার মনের সকল দুঃখ—সকল নিরানন্দ

দূরে গেল; তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ভাইপোটির কিন্তু এ সব ভাল লাগিতেছিল না। তাই সে রামদাসকে বারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, রামদাস তাহার কথা শুনিল না, তখন সে একাকী গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইল। রামদাসের পিতামাতা তাহার মুখে সকল কথাই শুনিলেন। রামদাস যেখানে ছিলেন তাঁহার পিতা এক আত্মীয় সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামদাসকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে কত বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই যাইতে রাজী হইলেন না। পিতা দেখিলেন, রামদাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহজে যে তাহাকে রাজী করাইতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। তখন তিনি কুপিত হইয়া তাহাকে গালমন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে পিতা এক ফন্দি বাহির করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যদি আমার সহিত বাড়ী ফিরে না যাও, তা হ'লে আমি রাজদ্বারে গিয়ে বল্‌ব, তোমার গুরুদেব তোমাকে ভুলিয়ে এনে চেলা করেছে।" এই কথা শুনিয়া রামদাসের খুব রাগ হইল। তিনি জোরের সহিত উত্তর করিলেন, "বাবা, আমি আর এখন বালক নই; আমিও রাজদ্বারে গিয়ে বল্‌ব, গুরুদেব আমাকে ভুলিয়ে চেলা করেন নি, আমি নিজের ইচ্ছাতেই তাঁহার চেলা হ'য়েছি এবং

ঘরবাড়ী ছেড়ে বৈরাগ-আশ্রম গ্রহণ ক'রেছি।" ঐ কথা শুনিয়া রামদাসের পিতা বিপদ্ গণিলেন, কারণ তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রামদাসের গুরুদেবের পায়ে পড়িয়া কহিলেন, "মহারাজ, কৃপা ক'রে একটি বারের জন্য রামদাসকে বাড়ী যেতে আদেশ দিন। তার মা তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে বড়ই কাতর হ'য়েছে।" সাধুটি তখন রামদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাচ্চা, সাধুদের একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়, ইহাতে কোন দোষ নাই। আর সাধুদের নিকট সকল স্থানই সমান। তুমি তোমার পিতার সঙ্গে যেয়ে জন্মস্থান দর্শন ক'রে এস।" রামদাসও গুরুদেবের আদেশ পাইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

রামদাস পিতার সঙ্গে জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বৈরাগ-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহে বাস করিতে নাই, কাজেই পূর্ব্বে যে বটবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন, তাহারই নিম্নে আসন স্থাপন করিলেন। ইহাতে তাঁহার মা খুব কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু রামদাস তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। প্রতিদিন বহু গ্রামবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইত, তাহারা প্রস্তাব করিল, "রামদাস এক এক দিন এক এক বাড়ী যেয়ে ভিক্ষান্ন

গ্রহণ কর্‌বে।” রামদাস ঐ কথায় রাজী হইলেন। কহিলেন, “আমি সকলের বাড়ী যেয়েই ভিক্ষান্ন গ্রহণ কর্‌ব, কিন্তু আমার মায়ের বাড়ীতে যাব না, কারণ সেখানে গেলেই মা ভীষণ কান্না-কাটি কর্‌বেন।” এই কথা শুনিয়া রামদাসের মাতা কহিলেন, “না বাছা, আমি কাঁদ্‌ব না; তোমাকে আমাদের বাড়ী যেয়েও ভিক্ষান্ন গ্রহণ কর্‌তে হবে।” রামদাস রাজী হইলেন। যথানিয়মে রামদাস যেদিন এক বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন, সে দিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। রাত্রিতে রামদাস ধীর স্থির ভাবে আসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় গায়ত্রী দেবী চারিদিক আলোকিত করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন। কহিলেন, “বৎস, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হ’য়েছি। বাকী পঁচিশ হাজার জপ তোমায় আর কর্‌তে হবে না; ইচ্ছামত তুমি বর লও।” রামদাস দেবীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “মা, আমি এখন বৈরাগ-আশ্রম গ্রহণ ক’রে সাধু হয়েছি, কাজেই আমি আর কি বর চাইব? তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক এই প্রার্থনা।” “তাই হবে” বলিয়া দেবী অদৃশ্যা হইলেন।

পালা অনুসারে রামদাস একদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে পিতৃ-গৃহে উপস্থিত। মাতা তাঁহার সম্মুখে অন্নের থালা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামদাস অনেক করিয়া

তাঁহাকে বুঝাইলেন, কহিলেন, "মা, এরূপ কান্নাকাটি কর্‌লে আমি কি ক'রে খেতে পারি?" তাঁহার কথায় মাতা নিজেকে কতকটা শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু চোখ হইতে তখনও জল পড়িতেছিল। যাহা হউক, রামদাস আহার করিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে মাকে কহিলেন, "মা, আমি আজ যে পথ গ্রহণ ক'রেছি, তাতে তোমাদের এবং আমার উভয় পক্ষেরই মঙ্গল, অতএব এজন্য তোমার দুঃখ করা কিম্বা কাঁদা উচিত হয় না।" মাতা বলিলেন, "আচ্ছা বৎস, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি কল্যাণ লাভ কর; আমি আর কাঁদ্‌ব না, তুমি পালামত এসে আমার বাড়ীতেও ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌বে।" তৎপর কিছুকাল রামদাস জন্মস্থানে বাস করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অন্য এক সময়ে রামদাস উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন, কোন উঁচু পাহাড়ের নীচে একটি পাথর যেন আল্‌গা ভাবে রহিয়াছে। কি খেয়াল হইল, তিনি দু'হাত দিয়া ঐ পাথরখানি সরাইলেন, দেখিতে পাইলেন ইহা একটি গুহার মুখ। তাঁহার কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল, গুহার মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই গুহায় বিরাটকায়, জটাজুটধারী, লোলচর্ম্ম

এক সাধু যোগাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সাধুটির এত অধিক বয়স হইয়াছিল যে তাঁহার চোখের উপরকার চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়া চোখ দুইটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সাধুকে দেখিয়া রামদাস আস্তে আস্তে গুহার বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সাধুটিও পিছনে পিছনে বাহিরে আসিলেন এবং দু'হাত দিয়া চোখের চামড়া তুলিয়া ধরিয়া রামদাসের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার সে চাহনি কি ভীষণ! যেন চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে! গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" রামদাস ভয়ে জড়সড় হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, দাস আপনার চেলা।" সাধু—"বেশ কথা, তা'হলে আমি যা বল্‌ব তা কর্‌তে পার্‌বে?" রামদাস —"হাঁ মহারাজ পার্‌ব।" যেখানে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথা হইতেছিল তাহার প্রায় পঞ্চাশ হাত নীচ দিয়া গঙ্গানদী ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সাধু হাত দিয়া ঐ স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "তা'হ'লে ঐ স্থানে লাফিয়ে পড়।" রামদাসের তখন মহাবিপদ্‌, লাফাইয়া পড়িলে মৃত্যু, না পড়িলেও সাধুর হাতে রক্ষা নাই। কি করেন, অগত্যা "জয় গুরু" বলিয়া লাফ দিলেন। নদীর দু' ধারেই উচ্চ পাহাড়, অন্ধকারও বেশ ছিল। এ অবস্থায় লাফাইয়া পড়া কি যে ব্যাপার তাহা ত বুঝিতেই পার। কিন্তু একি!

সাধুটি ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলেন এবং চোখের পলকে রামদাসকে জল হইতে তুলিয়া আনিলেন। ইহাতে রামদাসের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি সাধুর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, সাধু তখন স্নেহের সহিত বলিলেন, "হাঁ বাছা, তুমি চেলা হইবার উপযুক্তই বটে। যা'হক তুমি এখানে আর থেকো না। এ স্থান মুনি ঋষিদের আবাসভূমি। এখানে থাক্‌লে তোমার বিপদ্ ঘট্‌তে পারে।" সাধুর উপদেশ রামদাস মাথায় করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

তিন

রামদাসের গুরুদেবের নাম শ্রী ১০৮ স্বামী দেবদাসজী, অযোধ্যা প্রদেশের কোন স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মত মহাপুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শক্তিও বড় অদ্ভুত ছিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এমনি করিয়া ছয় মাস তিনি একাসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে আপনা হইতেই হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইত। ঘুম ত তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তা' ছাড়া আহারও ছিল বড় অদ্ভুত রকমের। তিনি যখন সমাধি হইতে উঠিতেন তখন মাঝে মাঝে গাঁজা, চরসের ধূম এবং ধুনীর ভস্ম জলে গুলিয়া পান করিতেন কিন্তু ঐ ভস্মগোলা জল তিনি কিছুক্ষণ পরেই বমি করিয়া ফেলিতেন এবং ওজন করিলে দেখা যাইত তিনি যে পরিমাণ পান করিতেন তাহার একটুকুও কমে নাই। আহার সম্বন্ধে তিনি সচরাচর এইরূপই করিতেন, এখন তোমরা ইহাকে আহার করাই বল আর যাহা ইচ্ছা বল। এ ত গেল সাধারণ প্রতিদিনকার ব্যাপার। একবার তিনি ভারী মজা

করিয়াছিলেন। একদিন রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাচ্চা, আমার পেটের ভিতর বড় গরম হ'য়েছে, তুমি যদি কিছু দুধ এনে খাওয়াতে পার তবে ঠাণ্ডা হয়।" রামদাস গ্রাম ঘর খুঁজিয়া একটা হাঁড়িতে আধমণটেক দুধ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, গুরুদেব প্রয়োজন মত হাঁড়ি হইতে দুধ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু, একি! দেবদাসজী দু'হাতে ঐ ভাণ্ডটি তুলিয়া ধরিয়া একটানে সমস্ত দুধ খাইয়া ফেলিলেন। কাণ্ড দেখিয়া রামদাসের ত চক্ষু স্থির! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এতটা দুধ এক নিঃশ্বাসেই শেষ করিয়া ফেলিলেন। শুধু কি তাই! দুধ পান শেষ করিয়াই আবার বলিলেন, "বাচ্চা, আমার পেটের গরম কতকটা কমেছে বটে, কিন্তু এখনও পেট খুব গরম রয়েছে। আরও কিছু দুধ এনে দিতে পার্‌লে বেশ হয়।" রামদাস এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলেন। তারপর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জোড়হাতে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি ভগবান্‌, আপনার পেটের গরম কমাতে পারে এমন শক্তি কার আছে? আধ মণটেক দুধ এক সঙ্গে পান ক'রেও যখন বল্‌চেন আপনার পেটের গরম যায় নি, তখন আমার এমন কি শক্তি আছে যে আপনাকে তৃপ্ত কর্‌তে পারি?"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া দেবদাসজী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বৎস, এবার তুমি যাহা পার নিয়ে এস, তাতেই আমার পেট ঠাণ্ডা হবে।" রামদাস গুরুর কথা শুনিয়া আরও ৫।৭ সের দুধ যোগাড় করিয়া আনিলেন, সেই দুধ পান করিয়া গুরুদেব বলিলেন, "হাঁ বৎস, এবার আমার পেট ঠাণ্ডা হয়েছে—আমি তৃপ্ত হয়েছি।"

একবার দেবদাসজী ৩।৪টি চেলা সহ কোন জঙ্গলে আসন স্থাপন করিলেন। স্থানটি সহর হইতে কিছু দূরে ছিল। সেই জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর অভাব ছিল না। একদিন রাত দ্বিপ্রহর, দেবদাসজী তাঁহার চেলাদের বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেয়ে সহর থেকে দু'টাকার গাঁজা কিনে নিয়ে এস।" রাত দুপুরে সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়া সহরে যাওয়া বড় সহজ ছিল না। রামদাস দেখিল, অন্যান্য চেলারা ভয় পাইয়াছে এবং কেহই যাইতে রাজী নয়। সকলের চেয়ে রামদাস বয়সে ছোট কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তিনি সাহস করিয়া দেবদাসজীকে কহিলেন, "মহারাজ, আদেশ করেন ত' আমি যেতে পারি।" দেবদাসজী খুব খুসী হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন; কহিলেন—"তুমি সহরে যাও, সেখানে গেলে দুটি টাকাও পাবে।" রামদাসের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা অসীম, কাজেই গুরুর

আশীষ মাথায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইলে কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে তাহা তিনি ভাবিতেই পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরে রামদাস সহরে উপস্থিত হইলেন—চারি দিক নীরব, নিঝুম! ঐ দূরে একটি মাত্র গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে একটি লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "মহারাজ, সমস্ত দিন সাধুকে দুটি টাকা দান কর্‌ব ব'লে বসে আছি। আপনি এসে আমাকে বড় কৃপা করেছেন, এখন অনুগ্রহ ক'রে টাকা দুটি গ্রহণ করুন।" রামদাস টাকা দুইটি গ্রহণ করিলেন এবং মনে মনে গুরুদেবের আশ্চর্য্য মহিমা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তৎপর গাঁজার দোকানে যাইয়া দেখিলেন, দোকানদার ঘুমাইয়া আছে। যাহা হউক, তাহাকে জাগাইয়া গাঁজা খরিদ করিলেন। রামদাসের গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, তিনি গাঁজা হাতে পাইয়া সেখানে বসিয়াই সাজিয়া এক ছিলিম খাইলেন। তৎপর ফিরিয়া আসিয়া গুরুর সম্মুখে গাঁজা রাখিয়া প্রণাম করিবামাত্র গুরুদেব :বলিয়া উঠিলেন, "এম্‌নি ক'রে বুঝি গুরুসেবা করে? খাওয়ার জিনিষ নিজে খেয়ে গুরুকে কি দিতে আছে?" রামদাস প্রমাদ গণিলেন—বুঝিলেন গুরু অন্তর্য্যামী। তাঁহার নিকট দূরে থাকিয়াও কিছু লুকাইবার উপায় নাই। তখন তিনি গুরুর নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করিলেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এবার ক্ষমা কর্‌লেম, এমনটি আর কখনও করো না। গুরু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্। সকল সময়েই শিষ্যের সঙ্গে থাকেন। তাঁহাকে লুকিয়ে কোন কাজ, এমন কি কোন চিন্তাও করা সম্ভব নয়।" রামদাস গুরুর অপার মহিমা অবগত হইয়া, "এইরূপ আর কখনও করিবেন না", মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

আর একবার দেবদাসজী প্রায় এক হাজার সাধু সঙ্গে করিয়া পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের নিকট আসন স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের জন্য প্রতিদিন শত শত ধনী, দরিদ্র ও ব্যবসায়ী তথায় গমন করিত। একদিন দেবদাসজী এক শাল-ব্যবসায়ী কোন ধনী ব্যক্তিকে কহিলেন, "আজ তুমি সাধুদের ভোজন করাও।" সে রাজী হইল না, অধিকন্তু সাধুদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। "বানিয়া, টাকার বড় গরম হয়েছে, আচ্ছা, দেখা যাবে।" এই বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎ জল ধুনীতে নিক্ষেপ করিলেন। মহাপুরুষদের সকলই অদ্ভুত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কত অসম্ভব সম্ভব হয়। শাল-ব্যবসায়ী বাড়ী গিয়া দেখিল তাহার শালের সিন্দুকে শালের বস্তায় আগুন ধরিয়াছে। বানিয়া আর কি করে? উপায়ান্তর না দেখিয়া

দেবদাসজীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কহিল, "আমার সর্ব্বনাশ হ'তে চলেছে, কৃপা ক'রে আমায় রক্ষা করুন। আজ হ'তে সাত দিন আমি সাধুভোজন করাইব।" তখন দেবদাসজী বলিলেন, "আচ্ছা যাও, একখানা মাত্র শাল তোমার অন্যায়ের দণ্ডস্বরূপ নষ্ট হ'বে, আর কিছুই হবে না।" কি আশ্চর্য্য, ঠিক সেই সময়ে একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, সিন্ধুকের মধ্যে প্রথম যে শালখানায় আগুন ধরিয়াছিল তাহা বাহির করিয়া ফেলাতে অন্যগুলি রক্ষা পাইয়াছে। বানিয়া তখন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া দেবদাসজীকে প্রণাম করিয়া সাধুভোজনের ব্যবস্থা করিতে উঠিয়া গেল। রামদাস এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। আর এতে কে না আশ্চর্য্য হয়? তিনি দেবদাসজীকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই ব্যাপার দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছি, যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে এ সম্বন্ধে আমি কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা করি।" দেবদাসজী তখন বলিলেন, "বৎস, যাঁহারা যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহাদের অনেক রকম বিদ্যা জানা থাকে। প্রয়োজন হ'লে তাঁহারা ঐ সব বিদ্যা কাজে লাগান। আজ যে বিদ্যা দ্বারা বানিয়াকে শিক্ষা দিলাম, তাহার নাম কালানল বিদ্যা। বানিয়া বেশ ভাল লোক, কিন্তু কিছু টাকা হওয়াতে

তার বড় টাকার গরম হ'য়েছে। তাই তাকে এইরূপভাবে শিক্ষা দিলেম, এতে তার ভালই হবে, এখন হ'তে ধর্ম্মপথে চল্‌বে। সময়ে এই বিদ্যা আমি তোমাকে দান কর্'ব—তাহা তুমি খুব গোপনে রাখ্‌বে, যাকে তাকে দেবে না।"

কোন সময় এক মুসলমান নবাব ঘোষণা করিলেন তাঁহার বাটীর নিকটে কেহ শঙ্খ বা ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারিবে না। যে কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে তাহার মাথা যাইবে। দেবদাসজী নবাবকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় ঐ স্থানে আসন স্থাপন করিয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। নবাব শঙ্খধ্বনি শুনিয়া কে এইরূপ করিতেছে জানিবার জন্য তাঁহার লোকজনকে আদেশ করিলেন। তাহারা ফিরিয়া গিয়া কহিল, "জাহাঁপনা, এক সাধু্ শঙ্খধ্বনি করিতেছে।" সংবাদ শুনিয়া নবাব ত রাগিয়া আগুন। আদেশ করিলেন, "যেই হোক, সে আমার আদেশ অমান্য ক'রেছে—তার মাথাটি আমার চাইই।" আর কথা কি? লোকজন, সিপাই-সান্ত্রী সাধুজীর মাথা আনিতে ছুটিল। তাহারা যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেখিল কে যেন সাধুটিকে পূর্ব্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া এক স্থানে মাথা এক স্থানে পা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা নবাবকে এই সংবাদ প্রদান করিল। কিন্তু একি! কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই পুনরায় শঙ্খধ্বনি।

আবার লোকজন ছুটিয়া তথায় উপস্থিত। কেউ কোথাও নাই—স্থানটি শূন্য ; কাজেই নবাবকে যাইয়া এই সংবাদ দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর কিছু করিবার রহিল না। সংবাদ দিতে তাহারা নবাবের নিকট উপস্থিত। ঐ আবার শঙ্খধ্বনি ! নবাব বিস্মিত হইলেন এবং একটু ভাবনায়ও পড়িলেন। ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন শক্তিমান্ পুরুষ ঐরূপ শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, তাঁহার অসন্তোষ বিধান করিলে রাজ্যের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবে না। অতএব তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই উচিত। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হইতেছিল নবাব লোকজনসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক দীর্ঘকায় সাধু সেখানে উপবিষ্ট। তাঁহার সুদীর্ঘ জটাজাল, উজ্জ্বল চক্ষু, হস্তে শঙ্খ এবং শরীর হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছে। তাহা দেখিয়া নবাব মুগ্ধ হইলেন। সাধুকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন "আমার প্রতি যদি আপনার কিছু আদেশ থাকে তবে বলুন, আমি তাহা পালন কর্‌ব।" তখন দেবদাসজী কহিলেন "দেখ, তুমি শঙ্খ বাজাতে নিষেধ ক'রে আদেশ জারী করেছ, তা মোটেই ভাল করনি, ইহা তোমার পক্ষে বড় অন্যায় হয়েছে। তুমি মুসলমান, তোমারও নিজের ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি পালন কর। কাজেই হিন্দু

যদি তার ধর্ম্ম কর্ম্ম করে তাতে তুমি বাধা দেবে কেন? তোমার এই অন্যায় আদেশ তুমি তুলে নাও।” নিকটেই একটি পুরাতন মন্দির ছিল, তিনি আরও বলিলেন—“আমি মন্দিরটি নূতন তৈরী কর্‌বো, তাতে তুমি বাধা দিতে পার্‌বে না।” নবাব আর কি করেন। কথায় বলে “শক্তের ভক্ত নরমের যম”। কাজেই তিনি দেবদাসজীর কথায় রাজী হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

চার

রামদাস এবার সাধনে মন দিলেন, সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। উত্তরাখণ্ডে ভীষণ শীত, সর্ব্বদাই বরফ পড়ে। গুরুর আদেশ সমস্ত রাত জাগিয়া ভজন করিতে হইবে। শীত নিবারণের ব্যবস্থাও সামান্য তিন হাত মাত্র কাপড়। সম্মুখে অবশ্য ধুনি জ্বলিত, কিন্তু তাতে কি হবে? একদিন রাত্রিতে নাম করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন, ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন,—ভীষণ শীত, বরফ পড়িয়া ধুনি নিবিয়া গিয়াছে। হাত পা অসাড়—শরীরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া প্রাণ যায় আর কি। অতিশয় ভাবনায় পড়িলেন। ধুনি জ্বালাইতে না পারিলে আর ত রক্ষা নাই। অথচ আগুনই বা কোথায় পাওয়া যায়? নিকটেই একটা ঝুপড়ির মধ্যে গুরুদেবের আসন। সেখানে গেলে আগুন মিলিবে সত্য, কিন্তু যাইবার উপায় নাই। গুরুদেবের কড়া হুকুম—"রাত্রিবেলা আসন ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যাইবে না।" অন্য কাহারও কাছে গেলেও গুরুদেবকে ফাঁকি দেওয়া হয়—উভয় সঙ্কট—অবশেষে ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায়, মরমে মরিয়া গুরুদেবের ঝুপড়ির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল "কে"?

"আমি রামদাস।" "আসন ছেড়ে এখানে কেন?" "মহারাজ, আমার ধুনি নিবে গেছে, আগুন নিতে এসেছি।" আর যায় কোথায়! গুরুদেব বলিলেন—"নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তা না হ'লে আগুন নিব্‌বে কেন? বাড়ী ঘর ছেড়ে, বাপ মাকে কাঁদিয়ে কি ঘুমোবার জন্যে এখানে এসেছ? সাধন ভজনই যদি না কর্‌বে—তবে পিতামাতার মনেই বা কষ্ট দেওয়া কেন?" রামদাস তখন বিনীতভাবে বলিলেন—"মহারাজ, এখন হ'তে সাবধান হ'ব, এবার ক্ষমা করুন।" গুরুজী কহিলেন—"যেখানে আছ সেখানেই এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক, তারপর আগুন পাবে।" দেবদাসজীর কথা অমান্য করে কাহার সাধ্য—কাজেই রামদাস সেই ভীষণ শীতে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে গুরুদেব তাঁহাকে আগুন দিলে তিনি তাঁহার আসনে ফিরিয়া আসিলেন।

অন্য একদিন দেবদাসজী রামদাসকে বলিলেন "আমি কোন বিশেষ কাজে অন্যত্র যাইতেছি। ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এখানে বসে থাক্‌তে পারবে?" রামদাস গুরুর মহিমা অবগত ছিলেন, কাজেই বলিলেন—"হ্যাঁ মহারাজ, আপনার কৃপায় পার্‌বো।" দেবদাসজী চলিয়া গেলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন এম্‌নিভাবে দিন যায়, তাহার আর

কোন খবরই নাই। অবশেষে আট দিনের দিন দেবদাসজী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রামদাস তখনও সেখানে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বৎস, একটি বারের জন্য কোথায়ও যাও নাই?” রামদাস—“না মহারাজ।” দেবদাসজী—“কিছুই খাও নাই?” রামদাস—“না মহারাজ, খিদে বোধ করিনি।” দেবদাসজী—“শৌচাদিও কর্ত্তে যাও নি?” রামদাস—“আপনার কৃপায় এ কয়দিন আমার মলমূত্রের বেগই পায় নি।” তখন দেবদাসজী ভারী খুসী হইয়া বলিলেন—“হাঁ বৎস, এমনি ক’রে গুরুর আদেশ পালন কর্‌লেই ভগবান্ সন্তুষ্ট রহেন। পিতামাতাকে কাঁদান সার্থক হয়।”

এই ভাবে রামদাসের সাধন চলিতে লাগিল। গুরুদেব দিনের পর দিন তাঁহাকে হঠযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রামদাসও মনের আনন্দে উৎসাহের সঙ্গে গুরুসেবা করিয়া দিনের পর দিন সাধনপথে চলিতে লাগিলেন। বহুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন দেবদাসজী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। লাঠি হাতে—রামদাসকে মারিতে লাগিলেন। সে কি মা’র! রামদাসের সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন—“আমি তোকে চাই না—তুই এখনই এখান হ’তে চ’লে যা।”

রামদাস তখন জোড়হাতে কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আমি আর কোথায়ও যাব না, আপনার ইচ্ছা হয় মারুন, ইচ্ছা হয় রাখুন। এতদিন বাড়ী-ঘর ছেড়ে আপনার নিকটেই আছি, আপনাকে পিতামাতা ভাই বন্ধু জ্ঞান ক'রে আস্‌ছি। এখন আমি আর কোথায় যাব?" গুরু যখন দেখিলেন এত মার খাইয়া, এত যন্ত্রণা সহিয়াও রামদাস তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক, তখন ভারী খুসী হইয়া কহিলেন—"আজ তোমার সকল পরীক্ষা শেষ হইল—সমস্ত পরীক্ষায়ই তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি—তোমাকে বর দিতেছি, শীঘ্রই তোমার ভগবৎ দর্শন হ'বে, সকল দুঃখের অবসান হ'বে, আজ হ'তে তুমি যা ইচ্ছা কর্‌বে তা'ই হবে, তোমার কথা কখনও মিথ্যা হ'বে না।" গুরুর আশীর্ব্বাদে রামদাসের আজীবনের সাধনা সিদ্ধ হইতে চলিল। সে কি আনন্দ!

একদিন রামদাস গুরুর কিঞ্চিৎ দূরে আসন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, একজন লোক আসিয়া সে সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ৪টি টাকা দিলেন। রামদাস বলিলেন—"এ কি কর্‌ছো, ঐ আমার গুরুদেব রয়েছেন, তাঁকে যেয়ে টাকা দাও।" লোকটি কিছুতেই এ কথা শুনিল না। রামদাসজীর সম্মুখেই টাকা কয়টি রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

তখন রামদাস টাকা কয়টি হাতে করিয়া গুরুর নিকটে যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ কি, তুমি আমার সাম্‌নেই ভেট গ্রহণ কর্‌ছো! গুরু বর্ত্তমানে পূজা গ্রহণ কর—সেত ভাল নয়।" রামদাস কহিলেন—"না মহারাজ, আমি ঐ ভেট গ্রহণ করি নি। বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমার সম্মুখে টাকা চার্‌টি রেখে একটি লোক চ'লে গেছে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করুন।" তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"এখন তুমিও সিদ্ধ হইয়াছ।" তারপর নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"এক বনে দুই বাঘের স্থান হয় না।"

গুরু কত ভাবেই না শিষ্যকে পরীক্ষা করেন। এরপর দুইদিন গত হইয়াছে। দেবদাসজী রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি একবার দ্বারকাধাম ঘুরে এস।" রামদাস প্রথমে গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে গুরুর একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া কহিলেন—"দ্বারকাধাম কোথায়, কোন্ দিকে আমি জানি না, কি ক'রে যাই?" দেবদাসজী আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, নীরব রহিলেন। পরদিন দেখা গেল, সেখানে দুইটি সাধু আসিয়াছেন, তাঁহারা দ্বারকাধামে যাইবেন। দেবদাসজী রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি বল্‌ছিলে দ্বারকা কি

ক'রে যাবে? এই দুইজন দ্বারকা যাইতেছেন, তুমি এঁদের সঙ্গে যাও। তোমার কোন ভয় নাই, পথে কোন অসুবিধাই হ'বে না, যখন যাহা প্রয়োজন আপনা হ'তেই জুটবে।"

রামদাস গুরুর আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া দ্বারকা তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন। বাস্তবিকই গুরুর কৃপায় পথিমধ্যে তাঁহার কোন কষ্টই হইল না। প্রয়োজন মত খাওয়া এবং অন্যান্য সাহায্য মিলিত। রামদাস দ্বারকা দর্শন করিয়া গুরুস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন—গুরুদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, শোকে দুঃখে তিনি পাগলের মত হইলেন—আপন হাতে নিজের মাথার জটা টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সে কি অবস্থা! দিনের পর দিন যায়, এমনি করিয়া ছয় দিন কাটিল। দয়াল গুরু, শিষ্যের দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। সাত দিনের দিন তিনি রামদাসকে দর্শন দিয়া কহিলেন—"বৎস, আমি মরি নাই, দুঃখ করো না, উঠ; কোন বিশেষ কারণে এ দেহ ত্যাগ করেছি। ইহা মৃত্যু নহে, লীলা মাত্র। আমি অপরে যা'তে দেখ্‌তে না পায় এমনিভাবে বাস কর্‌ছি, মাঝে মাঝে তোমাকে দর্শন দিব। তুমি শান্ত হও,

তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হ'বে।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

গুরুগতপ্রাণ রামদাস মরিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। সপ্তম দিনে গুরুবাক্যে সান্ত্বনা পাইয়া রামদাস স্নানাহার করিলেন। তখন হইতে গুরুদেব রামদাসকে মধ্যে মধ্যে দর্শন দিতেন। রামদাসের গুরুভক্তি কি গভীরই না ছিল! আর তাইতে তাঁর এমন গুরু!

পাঁচ

শাস্ত্রে আছে—মানুষ যখন হিংসাশূন্য হয় তখন বনের পশুপক্ষীও তাহার নিকটে নির্ভয়ে গমন করে, তাহাকে ভালবাসে। রামদাস সাধনবলে অহিংস হইয়াছেন, কাজেই তিনি যখন ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন কত ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প তাঁহার পথে পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে কিছুই বলে নাই। একবার কোন জঙ্গলের মধ্য দিয়া কয়েকজন সাধুর সঙ্গে রাস্তা চলিতেছিলেন। সে সময় দলের সর্ব্বাগ্রে যে সাধুটি ছিলেন তিনি হিংস্র জন্তুর ভয়ে সকলের পশ্চাতে গমন করিলেন। তখন রামদাস "আমি আগে যাচ্ছি" বলিয়া দলের প্রথমে চলিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা কিছুদূর যাইতে না যাইতেই একটী সুবৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়া সেই পিছনের সাধুটিকে লইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু সেই জঙ্গলে রামদাস বা অন্য কাহারও কোন অনিষ্ট হইল না। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় তাঁহারা যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন।

অন্য এক সময়ে তিনি যখন উত্তরাখণ্ডের এক পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন ভগবান্ ছদ্মবেশে সাধু সাজিয়া

তাঁহার সহিত বাস করেন। একদিন ঐ সাধু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এক পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছো বলত?" রামদাস বলিলেন—"পরিষ্কার সুনীল আকাশ।" সাধু পুলের নীচে জলের দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ওখানে কি দেখ্‌ছ?" রামদাস—"জল।" সাধু বলিলেন—"এখন উপরে তাকাও তো, কি দেখ্‌ছো?" রামদাস বলিলেন—"বাঃ, এ যে এক ভোজবিদ্যা! এইমাত্র সুনীল আকাশ দেখ্‌ছিলুম, এখন দেখ্‌ছি সমস্ত আকাশ কাল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে।" সাধু চলিতে চলিতে নদীতে নামিলেন, হাঁটিয়াই তাঁহারা নদী পার হইলেন, জল হাঁটুর উপরে উঠিল না। এইরূপে আরও কতদূর অগ্রসর হইলে রামদাস এক শ্মশান দেখিতে পাইলেন। কোথাও বা ছিন্ন শব পড়িয়া আছে, কোথাও বা শ্মশান-চুল্লী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কী ভীষণ সে দৃশ্য! আরও এক মজা—রামদাসের সঙ্গী সাধুটি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন; চারিদিকে অনেকক্ষণ খুঁজিলেন, কিন্তু পরিশ্রমই সার হইল, সাধুর দেখা পাইলেন না। পরে যখন রামদাস ঐ রাস্তা দিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, যে শ্মশান-দৃশ্যও অদৃশ্য হইয়াছে, সেখানে নানাবিধ বৃক্ষ-লতায় পরিপূর্ণ ভীষণ বন। তিনি বুঝিতে পারিলেন,

এতদিন ভগবান্ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া খেলা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতে পারেন নাই।

অন্য এক সময়ে রামদাস হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়ে তিন শত বৎসরের এক সাধু দেখিতে পাইলেন। সেই সাধু তাঁহাকে আদর-যত্ন করিয়া ফলমূল খাইতে দিলেন এবং বলিলেন, সাধুর কথা তিনি যেন কাহাকেও না বলেন। রামদাস সাধুর কথা না শুনিয়া অপরাপর বহু সাধুকে সঙ্গে লইয়া সেই পাহাড়ে সাধু-সন্দর্শনে গমন করিলেন, কিন্তু কেহই কোথাও নাই! আশ্চর্য্য ব্যাপার, সেই সাধু, সেই গুহা, সকলই অদৃশ্য হইয়াছে। কি আর করেন; সাধু-দর্শনে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সকলেই ফিরিয়া আসিলেন।

তোমরা আগ্রার নাম শুনিয়াছ—সেইখানেই বিশ্ব-বিমোহন তাজমহল, তাহারই সম্মুখ দিয়া যমুনা নদী কুলুকুলু নাদে ছুটিয়া চলিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যমুনায় অনেকগুলি জাহাজ গোরা সৈন্যে পরিপূর্ণ। সে সময় একদিন রামদাসজী যমুনার তীর দিয়া যাইতে-ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক গোরা সৈন্যের ভারী সখ্ হইল যে গুলি করে। বন্দুক হাতে করিয়া গুলি ছুঁড়িল; কিন্তু সাধুজীর গায়ে লাগিল না—গুলি কাণের পাশ দিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। সাহেব এতে সন্তুষ্ট

না হইয়া পুনরায় গুলি ছুঁড়িলেন, ফল ঠিক একই। আগেকার মত এবারও গুলিটি অন্য কাণের পাশ দিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে সাহেবের রোখ্ আরও চড়িয়া গেল, আবার গুলি করিবার জন্য যেমনি বন্দুকটি হাতে তুলিয়া লওয়া অমনি তাহা হাত হইতে জলে পড়িয়া গেল। সেই সাহেব এবং জাহাজের অন্যান্য সাহেব মেমেরা ইহাতে যারপরনাই বিস্মিত হইল। তখন সকলে মাথার টুপি খুলিয়া রামদাসজীকে তাঁহাদের কায়দা কানুনে অভিবাদন করিল। মানুষ যখন সাধনবলে ও ভগবৎকৃপায় শক্তিসম্পন্ন হয়, তখন তাহার অনিষ্ট করে কার সাধ্য!

সাধুরা কখনো কখনো ধুনী তাপিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঘুঁটে দ্বারা চারিদিকে ধুনী জ্বালিয়া মাঝখানে বসিয়া সাধন করেন। রামদাসজী একবার কোন গ্রামে এইরূপে পঞ্চধুনী তাপিতেছিলেন। গ্রামের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। অন্য এক সাধুর ইহা সহ্য হইল না। তিনি রামদাসকে মারিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। সুযোগও মিলিল। একদিন রামদাস পঞ্চধুনী জ্বালিয়া তন্মধ্যে যোগাসনে ধ্যানমগ্ন; সাধুটি সময় বুঝিয়া তাঁহার চারিদিকে খুব উঁচু করিয়া ঘুঁটে সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। আগুন যখন

দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। গ্রামবাসী অবস্থা দর্শনে হায় হায় করিতে লাগিল। রামদাসজী পুড়িয়া মরিবে এই তাহাদের নিশ্চয় ধারণা। কিছুকাল পরে আগুন যখন আপনা আপনি জ্বলিয়া নিভিয়া গেল, তখন দেখা গেল রামদাসজীর কিছুই হয় নাই—তাঁহার শরীর অক্ষত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া গ্রামবাসীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা রামদাসজীকে যোড়হাত করিয়া কহিলেন—"আপনি হুকুম করেন ত আজ যে সাধু আপনাকে পুড়িয়ে মার্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল তাকে ধ'রে এনে শাস্তি দিই।"

রামদাসজী—"তার কোন প্রয়োজন নাই, সে অন্যায় ক'রে থাক্‌লে ভগবান তার শাস্তি দিবেন।" এই ঘটনার দুই দিন পর অন্য একটি অন্যায়ের জন্য সেই সাধু ধৃত হইয়া ছয় মাসের জন্য জেলে গেল।

রামদাসজীর সাধনা ব্যাপার বড় সহজ ছিল না। গ্রীষ্মকালে পঞ্চধুনী জ্বালিয়া সাধন করিতেন। আবার শীতকালে জলে যোগাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এইভাবে বহু বৎসর কঠোর সাধনা করিলেন; তৎপর ব্রজধাম শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে ভরতপুরে "সয়লানির" কুণ্ডের

নিকটে কিছুকাল অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ঐখানেই তিনি সর্ব্বপ্রথম ভগবৎদর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

একটা কথা তোমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে। দেবদাসজী রামদাসকে কাঠের কৌপীন পড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম এ নিয়ে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইত। শুইতে গেলেই কাঠের এত বড় আড়বন্দ কোমরে বড় লাগিত, সেতো বুঝিতেই পার। যাহা হউক ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া গেল। এই কাঠের কৌপীনের জন্যই লোকে তাঁহাকে রামদাস "কাঠিয়া বাবা" বলিত।

কাঠিয়া বাবা এইবার সিদ্ধ হইয়াছেন—চেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম চেলা শ্রীযুত গরীবদাসজী, এক ব্রাহ্মণ বালক; দ্বিতীয় চেলা শ্রীযুত ভগবান দাসজী; তৃতীয় চেলা শ্রীযুত ঠাকুর দাসজী; চতুর্থ চেলা শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসজী। তাহার পর তিনি ক্রমশঃ বহু চেলা করেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালীই বেশী।

হাতরাসে এক বড় জমীদার ছিলেন। তিনি একবার বাবাজী মহারাজের খুব সেবা করিয়া তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন, কারণ তাঁহার কোন ছেলে ছিল না। বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"তোমার পুত্র হ'বে, কিন্তু তুমি শ্রীবৃন্দাবনে

একটি ঠাকুর-মন্দির তৈরী করে দিবে।" জমীদারটি এ কথায় স্বীকৃত হইলেন। বাবাজীর আশীর্ব্বাদে বৎসর মধ্যে তাঁহার এক ছেলে হইল। রথের পর কাঠিয়া বাবা হাতরাসে যাইয়া জমীদারকে শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির তৈয়ার করিয়া দিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে জমীদার এ কথা সে কথা বলিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞারক্ষায় মোটেই মনোযোগী হইলেন না। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"পুত্র ছিল না, সাধুর বরে পুত্র পেয়ে খুব অহঙ্কার হয়েছে! মনে কর্‌ছো আর কি? আচ্ছা, বল্‌ছি তিন দিনের মধ্যে এ ছেলের মৃত্যু হবে।" বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, তৃতীয় দিনে ছেলের মৃত্যু হইল। জমীদার-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বাবাজীর পায়ে পড়িয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বাবাজীর দয়া হইল, বলিলেন—"যাও, তোমার আরো দুটি ছেলে হ'বে; কিন্তু সাবধান, সাধুদের নিকট কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা চাই। আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাই না।"

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাবাজী মহারাজ প্রথমে দাবানল কুণ্ডের নিকট এবং তৎপর যমুনার তীরে গঙ্গাজীর কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী ঘাটে বাস করিতে লাগিলেন। সে সময়ে বৃন্দাবনে মস্ত বড় এক পালোয়ান ছিলেন, তাঁহার নাম ছন্নু সিং। তিনি

বাবাজীর নিকট গাঁজা খাইবার জন্য যাতায়াত করিতেন। বাবাজী গাঁজা খাইতেন তাহা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একদিন ছন্নু সিং বাবাজীর নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটি ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হইল। এই লোকটির নাম "গোসাঞা"। সে বড় সহজ পাত্র ছিল না, এক ডাকাতের দলের সর্দ্দার। তাহার অসীম সাহস ছিল—যাহা ইচ্ছা করিয়া বেড়াইত; কিন্তু পুলিশ তাহাকে সহজে ধরিতে পারিত না। অবশেষে বহু চেষ্টা-চরিত্রের পর সে ধরা পড়িল এবং বিচারে চৌদ্দ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে গেল; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার স্বভাব পূর্ব্বে যেমনটি ছিল তেমনই রহিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া ছন্নু সিং বাবাজী মহারাজকে তাহার জীবনের সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিয়া কহিলেন—"মহারাজ, আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, ইচ্ছা কর্‌লে সবই কত্তে পারেন, অনুগ্রহ ক'রে এই দুর্দ্দান্ত গোসাঞাকে ভাল ক'রে দিন।" বাবাজী মহারাজ সকল কথা শুনিয়া গোসাঞাকে বলিলেন—"কিরে গোসাঞা, তুই আমার চেলা হবি?" তাঁহার এই কথার মধ্যে কি ছিল আমরা জানি না; কিন্তু সেই ভীষণ দুর্দ্দান্ত গোসাঞা তখনই তাঁহার চেলা হইতে রাজী হইল, এবং কহিল—"মহারাজ, জীবনে না ক'রেছি এমন কুকর্ম্ম নেই, আমাকে

চেলা কর্‌বেন তো ?” সাধু মহাত্মাদের দয়া অসীম ; তাঁহাদের নিকট ভালমন্দ আত্মীয়-পর ভেদ নেই। তাঁহাদের কৃপা কখন যে কাহার উপর বর্ষিত হইবে তাহা বুঝিবার আমাদের কি সাধ্য ? বাবাজী মহারাজ চোর গোসাঞাকে কৃপা করিয়া দীক্ষাদান করিলেন। এমনি আশ্চর্য্য যে দেখিতে দেখিতে চোর গোসাঞা একজন নূতন মানুষ হইয়া গেল, দুর্দ্দান্ত সে প্রেমিক হইল। সাধুদের কৃপা এবং ভগবৎনামের কি মহিমা !

গাঁজার লোভে অনেক সাধু অসাধু বাবাজী মহারাজের নিকট যাইত। তিনি সকলকেই প্রেমের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার নির্ভয় নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া একদিন তিনটি লোক তাঁহাকে শাসাইয়া বলিল—“কি বাবাজি ! কথা যে বল্‌ছো যেন ডর ভয় নেই ? অতটা ভাল নয়।” কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ কহিলেন—“তোদের সাহস ত বড় কম নয় ; শেষে কিনা তোরা আমাকেই শাসাচ্ছিস্ ! তোদের একটু শাস্তি দেওয়া দরকার। আমি বল্‌ছি আজই তোদের পুলিশ গ্রেপ্তার কর্‌বে।”

বাবাজী মহারাজের কথায় তাহারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধ মহাত্মার কথা কখনই ব্যর্থ হয় না—তাহারা সেই দিনই পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। মোকদ্দমার তারিখ পড়িলে তন্মধ্যে দুই ব্যক্তি আসিয়া বাবাজী মহারাজের চরণে

পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং আর কোন দিন চুরি করিবে না বলিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"আচ্ছা, যাও, তোমাদের কিছুই হ'বে না, কিন্তু সাবধান, আর কখনও সাধু মহাত্মাদের কাছে যাইয়া উৎপাত করো না এবং চুরি করো না।"

মোকদ্দমায় ঐ দুই ব্যক্তি খালাস পাইল এবং তৃতীয় ব্যক্তির ৪ মাসের জন্য জেল হইল। তাহার আপীলেরও কোন ফল হইল না। একদিন বাবাজী মহারাজ মথুরায় গিয়াছেন; দেখিতে পাইলেন সেই লোকটি রাস্তায় মাটী কাটিতেছে। তাহার কষ্টেরও অবধি হইয়াছে। সে বাবাজী মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিল। সাধুদের ত আর কাহারো প্রতি রাগ থাকে না, আপন পর সকলেই তাঁহাদের নিকট সমান। কাজেই লোকটির দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল, তিনি বলিলেন—"আজ হ'তে তিন দিনের মধ্যে তুমি মুক্ত হ'বে, কিন্তু সাবধান, আর কখনো ঐরূপ অন্যায় করো না।" সাধুর কথা কি ব্যর্থ হইতে পারে? উপর হইতে হুকুম আসিল, প্রত্যেক জেল হইতে তিনজন করিয়া কয়েদি মুক্ত হইবে। ফলে তৃতীয় দিবসে ঐ লোকটির মুক্তি হইল। বড়ই আশ্চর্য্য, না? কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিকই ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত—তাঁহাদের নিকট এ আর বেশী কথা কি?

ছয়

সে বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলা। বাবাজী মহারাজের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সমস্ত সাধুমণ্ডলী তাঁহাকে চৌরাশী ক্রোশ ব্রজধামের মোহন্ত করিলেন। সেইবার গাঁজা খাওয়া ব্যাপার নিয়া ঐ কুম্ভমেলায় ভারী রগড় হইয়াছিল। শক্তিমান্ পুরুষের সকলই অদ্ভুত। সাধুদের মধ্যে গাঁজা এবং চরস খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলিল। একটি লোক প্রায় সোয়া সের চরস ছিলিমে সাজাইয়া কে ইহা এক টানে জ্বালাইতে পারে, তাহার জন্য অনেককেই আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনেকেই চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে এক সাধু আসিয়া বাবাজী মহারাজকে কহিলেন—"ঐ ছিলিমের চরস যদি আপনি না উড়া'তে পারেন তা হ'লে সাধুদের আর মান থাকে না।" বাবাজী মহারাজ তাঁহার কথা শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং এক টানে ঐ সোয়া সের চরস জ্বালাইয়া বহু সাধু বৈরাগীর বিস্ময় উৎপাদন করিলেন।

অন্য এক সময় তাঁহার সঙ্গে দুই সের আন্দাজ সুলফা প্রাপ্ত হইয়া পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের

নিকট উপস্থিত করিল। আইন অনুসারে কাহারও নিকট এত সুলফা রাখার নিয়ম নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কেন এত সুলফা রাখিয়াছেন প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—"এ আর বেশী কি, আমি এ ত দুদিনেই খেয়ে ফেল্‌বো।" তাঁহার কথায় সাহেব একটু আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রমাণ দেখিতে চাহিল। তখন তিনি আধ পোয়া আধ পোয়া করিয়া ছিলিম সাজাইয়া দেখিতে দেখিতে ঐগুলি উড়াইতে লাগিলেন; সাহেব ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় মানিল এবং তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

তোমরা কুম্ভমেলার নাম শুনিয়া থাকিবে। হরিদ্বার, নাসিক, উজ্জয়িনী ও প্রয়াগ এই চারি স্থানে কুম্ভমেলা বসিয়া থাকে। বার বৎসর পর পর এক এক স্থানে পূর্ণকুম্ভ হয়। যে বৎসর যেখানে পূর্ণকুম্ভ হয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সেবার উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভ। মেলাস্থানে সাধু এবং সন্ন্যাসীদের আসনের স্থান পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে।

সাধু ও সন্ন্যাসী শব্দে কি পার্থক্য তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলে—এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত। কি কি, সে সব কথা পরে বলিব। বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁহারা বাড়ীঘর, আত্মীয়-স্বজন ও

বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটাইয়া বৈরাগ্য-আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধু বলে। শিবের উপাসককে শৈব এবং শক্তির উপাসককে শাক্ত বলে। এই শৈব এবং শাক্তদের মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে। এইবার আশা করি, তোমরা সাধু ও সন্ন্যাসীতে কি পার্থক্য তাহা বুঝিলে।

সেই বৎসর এক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী পূর্ব্বে তাঁহার অনুচরসহ মেলাস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে উজ্জয়িনীর রাজা শিষ্য হইলেন। ফলে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বৃথা অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। সংখ্যায়ও তাঁহারা অনেক। যথাসময়ে সাধুমণ্ডলী মেলাস্থানে আসন স্থাপন করিতে গেলে ঐ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় কিছুতেই তাঁহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দিলেন না। একে তাঁহারা সংখ্যায় অধিক, তদুপরি রাজা তাঁহাদের সহায়ক; কাজেই সাধুমণ্ডলীকে হার মানিতে হইল। যাহা হউক সাধুরা মেলার বাহিরে একে একে মিলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম হইল না, প্রায় ৬০ হাজার; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাবাজী মহারাজ ব্রজের মোহন্ত। প্রতি কুম্ভে ব্রজের মোহন্তের যাইবার নিয়ম। বাবাজী মহারাজ তাই কয়েকজন সাধু সঙ্গে করিয়া উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে ঐ বৃহৎ সাধুমণ্ডলীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?" তখন তাঁহারা বাবাজী মহারাজের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি কহিলেন—"তোমরা ভারী অন্যায় করেছ; সাধু হয়েও মরবার ভয় ? ভীরুর মত পালিয়ে এসেছ ? তোমরা তোমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার কর্‌তে যেয়ে যদি প্রাণও দিতে, তাতেই বা কি ক্ষতি ছিল ? বিষ্ণুনাম কর্‌তে কর্‌তে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হ'তে। আর তা না ক'রে মরণ ভয়ে পালিয়ে এসে সমস্ত বৈষ্ণবের পক্ষে দুর্নাম অর্জ্জন করেছ।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং আনন্দে কোলাহল করিয়া কহিলেন—"মহারাজ, আপনি আমাদের আগে আগে চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।" তাহাই হইল, বাবাজী মহারাজকে এক হাতীর উপর তুলিয়া, তাঁহাকে অগ্রে অগ্রে লইয়া মেলা স্থানে উপস্থিত হইলেন। এইবার কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল। বাবাজী মহারাজের সেই তপঃপূত উজ্জ্বল দেহকান্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া

দিলেন। কি সাধু, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের পক্ষেই ভীরুতা মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক।

বাবাজী মহারাজ সময় সময় বহু সাধু সঙ্গে করিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতেন। সমস্ত দিন চলিয়া তাঁহারা যখন যেখানে আসন স্থাপন করিতেন, সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাদের আহার যোগাইত। এই খাদ্য-সামগ্রী বণ্টন করিবার সময় মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে যে গণ্ডগোল সৃষ্টি না হইত তাহা নয়। সেবার তাঁহাদের দলে এক সন্ন্যাসী পরমহংস ছিলেন—তিনি এই সব দেখিয়া শুনিয়া যারপরনাই বিরক্ত হইয়া বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনার দলের সাধুদের দেখ্‌ছি সাধন বৈরাগ্য কিছুই নাই। খাওয়ার জন্যই ঘর ছেড়েছে। সামান্য খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে এত গোলমাল করে, এ ত সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ম নয়।" কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত বিনয়সহকারে কহিলেন "মহারাজ, কি ভাবে আমাদের চলা উচিত, আপনি যদি আদেশ করেন, আমরা ঠিক সেইভাবেই চল্‌বো।"

পরমহংসজী খুব খুসী হইলেন। তিনি মনে মনে অহংকৃত হইয়া বলিলেন,—"সাধুদের নিয়ম, কাহারো নিকট কিছু চাইতে নাই। আপনা হ'তে যা আস্‌বে তাতেই সন্তুষ্ট

থাকা। আর যদি কখনো কিছু নাও আসে, তাহলেও তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ কর্‌বে না।" তখন বাবাজী মহারাজ কহিলেন,—"বেশ কথা, আজ হ'তে আমি আমার আসন আপনার নিকট স্থাপন কর্‌বো, আপনি যে রকমটি আদেশ কর্‌বেন, আর কেহ না চল্‌লেও আমি ঠিক তেমনি চল্‌বো।"

তৎপর তিনি দলের সাধুদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"দেখ, আজ হ'তে গ্রামবাসীরা তোমাদের আহার যোগাবে না। যেখানে যেখানে আসন পড়্‌বে সেই সেই স্থানে গ্রামে যেয়ে নিজেদের আহার নিজেরাই যোগাড় কর্‌বে।" পর দিন অন্য এক স্থানে আসন পড়িল; কিন্তু গ্রামবাসীরা আহার যোগাইল না। সাধুরা গ্রামে যাইয়া যার যার ব্যবস্থা করিয়া লইল। বাবাজী ও পরমহংসজীর আসন পাশাপাশি। আসন ছাড়িয়া কোথাও না যাওয়াতে তাঁহারা উপবাসী রহিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন যায়—বাবাজী মহারাজ এবং পরমহংসজীর কোনই আহার নাই। বাবাজী মহারাজ অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগীপুরুষ, তাঁহার কি হইবে? কিন্তু পরমহংসজীর শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অষ্টম দিবসে তাঁহার প্রাণ যায় আর কি!

তিনি ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরভাবে বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"মহারাজ! আমার ত

প্রাণ যায় ; আপনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রাম হ'তে কিছু ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এসে আমার প্রাণরক্ষা করুন।"

বাবাজী মহারাজ—"সে কি পরমহংসজী, আপনি কি বল্‌ছেন ? বৈরাগ্যের লক্ষণ কি ভুলে গেলেন ? আপনিই না বল্‌ছিলেন সাধু সন্ন্যাসীদের কারো নিকট কিছু চাইতে নাই ; তাতে কিছু আসে ভাল, না আসে ক্ষতি নাই। এখন আবার কি ক'রে ভিক্ষা ক'রে আন্‌তে বল্‌ছেন ?" কথা শুনিয়া পরমহংসজীর চোখ খুলিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, না বুঝিয়া শুনিয়া সাধুদের নিন্দা করিয়া কাজটী ভাল করেন নাই। তখন বাবাজী মহারাজের নিকট হাতযোড় করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ বড় অন্যায় করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি না বুঝে সাধুদের প্রতি মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ভাল করিনি।" তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে বাবাজী মহারাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"পরমহংসজী, যাক, আর ভাব্‌বেন না, এখনই গ্রামবাসীরা খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আস্‌বে। তবে একটি কথা মনে রাখ্‌বেন, বৈষ্ণব সাধুরা কখন কি ভাবে খেলা করেন—তাহা বুঝা বড় কঠিন। অতএব না বুঝে শুনে তাঁহাদের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়।" পরমহংসজীর ঔদ্ধত্যের শিক্ষা খুব আচ্ছা রকমই হইল।

সমস্ত ব্রজধাম ৮৪ ক্রোশ অর্থাৎ ১৬৮ মাইল।

ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর পর প্রতি বৎসর সাধুরা এই ৮৪ ক্রোশ পরিক্রম করিয়া থাকেন। ব্রজের যিনি যখন মোহন্ত থাকেন তাঁহারও এই পরিক্রমায় যাইবার নিয়ম। তদনুসারে বাবাজী মহারাজ একবার বহু সাধু সঙ্গে করিয়া ব্রজধাম পরিক্রমা করিবার পর, মথুরায় আসিয়া আসন স্থাপন করিলেন। সে বৎসর সাধুদের মধ্যে নানারূপ গণ্ডগোল হওয়ায়, মথুরাবাসীরা তাঁহাদের আহার যোগাইল না। ফলে সাধুদের প্রথম দিন অনাহার। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাদের দর্শন করিতে লাগিল। একটি ব্রজবাসী সে সময় জুতা পায়ে বাবাজী মহারাজের ধুনীর কাছে বসিলে, অপর এক সাধু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি একি কর্‌ছ? জুতা পায়ে একেবারে সাধু মহাত্মার ধুনীর উপরে আস্‌ছ?"

ব্রজবাসী—"আরে রেখে দাও তোমার সাধু মহাত্মা! আমিও ব্রজবাসী, কিরূপ সাধু মহাত্মা তা দেখা গিয়াছে—খেতে না পেয়ে ত শুকিয়ে মর্‌ছো।" এইরূপে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলে সেই সাধুর সঙ্গে তাঁহার একটু বচসা হইয়া গেল। বাবাজী মহারাজ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু সমস্ত সাধুমণ্ডলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তিনি আর সহ্য করিলেন না। সেই লোকটির প্রতি এমন ভীষণভাবে

তাকাইলেন যে বাছা আর যায় কোথায় ? অমনি মাটীতে পড়িয়া কিছুক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করিল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী এই ব্যাপার দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং বাবাজী মহারাজের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাদের খাবার যোগাইতে লাগিল। মহাত্মারা যে কখন কি ভাবে লীলা করেন, বাহিরের ব্যাপার দেখিয়া সে কথা বুঝা কঠিন।

সাত

বাবাজী মহারাজের এক গুরু ভাই কোন ব্রাহ্মণ বালককে চেলা করিয়া তাহার নাম রাখিলেন প্রেমদাসজী। তিনি প্রেমদাসজীকে বাবাজী মহারাজের হাতে দিয়া বলিলেন—"ইহাকে তুমি আপন চেলার মত দেখ্‌বে, এ তোমার সেবা কর্‌বে।" বাবাজী মহারাজ তদবধি প্রেমদাসকে আদর করিয়া সঙ্গে রাখিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বাবাজী মহারাজ যমুনার তীরে থাকিতেন। পরে এক ব্রাহ্মণ কেমারবনে আশ্রম তৈয়ার করিবার জন্য জায়গা দান করিলে তিনি সেখানে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সে সময়ে প্রেমদাসজী এবং গরীবদাসজী প্রভৃতি কয়েকজন চেলা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। প্রেমদাসজী লেখাপড়া জানিতেন। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে এবং শুনিতে তাঁহার ভারী আনন্দ হইত। শ্রীবৃন্দাবনে স্থানে স্থানে প্রায়ই শাস্ত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। তিনি ঐ পাঠ শুনিতে যাইতেন। এক পণ্ডিতের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার মনে ধারণা জন্মিল যে ভগবান যখন সর্ব্বত্রই আছেন তখন

শুচি-অশুচি, ভাল-মন্দ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার সমস্তই মূল্যহীন। আশ্রমে আসিয়াও সকলের নিকট এই মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"ও ত পাগল হ'য়ে গেছে; নতুবা এরূপ বক্‌বে কেন? ওর কথার কি মূল্য?" কি আশ্চর্য্য, বাবাজী মহারাজের কথার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমদাসজী পাগলের মত আশ্রম হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একেবারে উন্মাদ—আহার নাই, নিদ্রা নাই, চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। গরীবদাসজী তাঁহার এই দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া বাবাজী মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন—"মহারাজ, প্রেমদাসজী ছেলেমানুষ, ভালমন্দ কিছুই বুঝে না। অনুগ্রহ ক'রে এর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।" বাবাজী মহারাজ "আমি আর কি কর্‌বো? আমি ত আর ডাক্তার নই।" গরীবদাসজী এ কথায় নিরস্ত না হইয়া প্রেমদাসজীর জন্য বার বার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তখন বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"যাক, যদিও ওর মতে সবই সমান, তথাপি ওকে ঠাকুরের প্রসাদী রুটি খেতে দাও। দেখুক, এর কি মাহাত্ম্য।" কথামত প্রেমদাসজীকে রুটী দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি তাহা খাইতে পারিলেন না। ইহা

তাঁহার নিকট বিস্বাদ ও তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"আর একবার খেয়ে দেখ্—স্বাদ কেমন?" বাস্তবিকই এইবার প্রেমদাসজীর নিকট ঐ রুটী যেন অমৃতের ন্যায় মনে হইল। তিনি আনন্দের সহিত উহা খাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাগল অবস্থাও সারিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! প্রেমদাসজী বাবাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,—"তুমি না বল্‌ছিলে সবই সমান; এখন কি দেখ্‌লে? বৈষ্ণব সাধুরা যে বিশেষ আচার নিয়মে থাকেন এবং প্রসাদী ভিন্ন অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, এ সব নিরর্থক নয়। বিচার আচারের খুবই প্রয়োজন আছে।" প্রেমদাসজী আর কি বলিবেন; নিজের চোখের উপরে যে কাণ্ড কারখানা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার কিছুই বলিবার রহিল না।

দোষ এবং গুণ দুই লইয়া মানুষ। প্রেমদাসজী নানাগুণের আকর ছিলেন, কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার একটি দোষ—তিনি বড় রাগী ছিলেন। বাবাজী মহারাজ একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—"ওরে তুই বড় রাগী। আজ হ'তে তুই মৌনী হ। বার বৎসর কারো সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবিনি।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা কহিবার শক্তি তিরোহিত হইল। সামান্য

"টুঁ" করিবার শক্তিও তাঁহার রহিল না। একবার তাঁহাকে এক সাপে কাটিল, অসহ্য যন্ত্রণা, কিন্তু মুখে সে কষ্ট প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

বার বৎসর অতীত হইলে বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"এতদিনে তোমার ব্রত শেষ হইয়াছে, এবার তুমি কথা বল।" তাঁহার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মৌনীজী তাঁহার লুপ্ত কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। মৌনীজী সর্ব্বদাই আপ্রাণ চেষ্টায় প্রেমের সহিত বাবাজী মহারাজের সেবা করিতেন। একবার কি কারণে তাঁহার বড় অভিমান হইল। তিনি বাবাজী মহারাজকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু চলিয়া গিয়াও তাঁহার মনে শান্তি নাই। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বাবাজী মহারাজের সেবা ঠিক ঠিক হইতেছে না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। বাবাজী মহারাজ সে সময় শুইয়া আছেন। মৌনীজী তাঁহার আসনের পাশে বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। মনে মনে তখনো তাঁহার অনুতাপ, তিনি কেন চলিয়া গিয়াছিলেন! চোখেও জল। কিন্তু একি! বাবাজী মহারাজ আসনে নাই। এইমাত্র তিনি সেবা করিতেছিলেন, তাঁহার হাত দুটি এখন শূন্যেই ঘুরিতেছে। ইহাতে মৌনীজী আশ্চর্য্য হইয়া কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

নিতান্ত দুঃখে তাঁহার চোখ হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। তাঁহার অনুতাপ দর্শনে বাবাজী মহারাজের দয়া হইল। আবার তিনি আসনে আসিলেন। একটু অভিমান-ভরেই যেন শিষ্যকে কহিলেন—"কিরে, আমি চ'লে গেলে সুখী হস্ তো ? তবে আমি চ'লে যাই।" মৌনীজী আর কি বলিবেন। তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গরীবদাসজীর মৃত্যুর পর প্রেমদাসজী বহুকাল প্রায় বার বৎসর বাবাজী মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনিও দেহত্যাগ করিলেন।

তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাবাজী মহারাজের বহু বাঙ্গালী চেলা। তাঁহাদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে তিনি যে সব অদ্ভুত লীলা করিয়া গিয়াছেন তাহার দু' একটি এখন তোমাদের বলিব। সে সময় কলিকাতা হাইকোর্টে একজন খুব বড় উকিল ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী। শ্রীহট্ট জেলার বামৈ গ্রামে তাঁহার জন্ম।

জীবনে ভগবানকে লাভ করিতে হইলে গুরু চাই, গুরু ভিন্ন জগতে কিছুই শিখা যায় না। তাঁহার প্রাণের আকুল আগ্রহ—ভগবান লাভ করিয়া জীবন ধন্য করেন। সৎগুরু না হইলে তাহা হইবে না; কাজেই গুরুলাভের জন্য তিনি বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন। এইরূপে দিন যায়—একদিন

বড় আশ্চর্য্যরূপে তিনি এক মন্ত্র পাইলেন এবং সে মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার সৎগুরু লাভ হইবে, এ আশ্বাসও তিনি সে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। যিনি ভগবানকে লাভ করিয়া জরা-মৃত্যু জয় করিয়া সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হন, তিনিই প্রকৃত সৎগুরু। এইরূপ গুরু ত আর সহজে মিলে না। আবার তিনিও এইরূপ মহাপুরুষ না পাইলে গুরু করিবেন না। তা করিবেনই বা কেন? যাকে তাকে গুরু করিলেও আর ভগবান মিলে না। যিনি নিজেই ভগবান্ লাভ করিতে পারিলেন না, তিনি কি করিয়া অন্যকে সেই পথ দেখাইতে পারেন?

আট

১৩০০ সনে প্রয়াগে কুম্ভমেলা। এই প্রয়াগ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে; ইহারই অপর নাম এলাহাবাদ। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্গে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দর্শনে যান। এই বন্ধুটির নাম শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায়। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুও এই মেলায় গমন করিয়াছিলেন এবং শিষ্যগণসহ মেলাস্থলে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই গোস্বামী প্রভুর নিকটে বিশেষ পরিচিত, তিনি তাঁহারই তাঁবুতে উঠিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে দেখিয়া খুব খুসী হইয়া বলিলেন—"মেলায় এসে বেশ ভাল ক'রেছেন, এখানে কত কত মহাপুরুষ এসেছেন—কাহারও কৃপা লাভ করতে পারলে জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে।"

এই হরিনারায়ণ বাবুর বড় ভাই শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায়। ইনি বাবাজী মহারাজের শিষ্য। এই কুম্ভমেলার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি অযাচিতভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করেন। এ সময় গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে ইনিও বাস করিতেছিলেন।

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই শ্রীযুত অভয় বাবু আসিয়া তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীযুত অভয় বাবু যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন— "আপনারা এসে বেশ ক'রেছেন। এই মাত্র আমি বাবাজী মহারাজের কাছ হ'তে আসছি। তাঁকে হরিনারায়ণের আস্‌বার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তিনি উত্তর কর্‌ছিলেন, এখনই আস্‌ছে। চলুন আপনারা তাঁকে দর্শন কর্‌তে যাবেন। উভয়ে শ্রীযুত অভয় বাবুর সঙ্গে সাধু দর্শনে বাহির হইলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, মস্ত বড় এক ছাতায় এক সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার শুভ্র জটাজাল, উজ্জ্বল দেহকান্তি এবং তিনি বয়সে অতি প্রাচীন। ইনিই শ্রী(১০৮) স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবা। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুত অভয় বাবু তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীযুত কাঠিয়া বাবা শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"একে তো আমি শ্রীবৃন্দাবনে দেখেছি।" কয়েক মাস পুর্ব্বে তিনি শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে সময় শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কিংবা আলাপ পরিচয় কিছুই হয় নাই; অথচ বাবাজী

মহারাজ কেন এবং কি ভাবে একথা বলিলেন, তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই মেলার প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে, কলিকাতা থাকাকালীন তাঁহার মনে এক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উদয় হয়, তখন তিনি এবিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াও মীমাংসা করিতে পারেন নাই। এত দিনে সে কথা আর তাঁহার মনেও নাই। এক্ষণে বাবাজী মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া নিজ হইতেই সেই প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন "একি! তিন মাস পূর্ব্বে সুদূর কলিকাতায় থাকার সময় নীরব নির্জ্জন রাত্রে আমার মনে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা ইনি জান্‌লেন কি ক'রে? তবে কি ভগবান্ দয়া ক'রে আমি যেরূপ সদ্‌গুরু খুঁজ্‌ছি তাহাই মিলিয়ে দিলেন?" যাহা হউক, তিনি অন্য কাহাকেও এসব কথা কিছু বলিলেন না। কিছু সময় পর তাঁহারা তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ সহ সাধু দর্শনে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারই অপর দুই শিষ্য অশ্বিনী বৈরাগী ও শ্রীধর তখনও বাহির হন নাই, এবং শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ও তখন তাঁবুতেই আছেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, শ্রীধর বলিতেছে—"গুরুদেবের এই সব কাণ্ড-

কারখানা ভাল লাগে না। এত সব শিষ্য করা কেন? বড় কাঠিয়া বাবাই বেশ, মাত্র চার জন চেলা ক'রেছেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বেশী চেলা কর্‌তে বারণ করেছেন, সেই ভাল।" এই কথা শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী সত্য বলিয়াই মনে করিলেন এবং ভাবিলেন—"আমি কাঠিয়া বাবা সম্বন্ধে যা মনে করেছিলুম, তা নয়।" সাধু-দর্শনে তিনিও বাহির হইলেন। মেলাস্থানে বহু সাধু দর্শন করিয়া শ্রীযুত কাঠিয়া বাবার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, আজ পর্য্যন্ত আমি পাঁচ জন চেলা করেছি সত্য, কিন্তু উপযুক্ত লোক পেলে আরও কর্‌বো।" শ্রীধরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা না করিয়াই শ্রীযুত কাঠিয়া বাবার মুখে তাহার বিপরীত কথা শুনিলেন; শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে আরও গাঢ়ভাবে এই চিন্তার উদয় হইল যে, শ্রীযুত বাবাজী মহারাজই তাঁহার গুরু হইবেন—নতুবা বিনা প্রশ্নে তাঁহার এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি? যাহা হউক এবারও তিনি নীরবই রহিলেন—কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিন্তু যখনই তিনি তাঁহার নিকট যাইতেন, তখনই এইরূপ কোন না কোন প্রশ্ন ও উত্তর লাভ করিয়া যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। অথচ তাঁহার

মনের এই সব প্রশ্ন এবং উত্তর অন্যের জন্য একান্তই অসম্ভব। পাঁচ ছয় দিন পর কলিকাতা ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের নিকট বিদায় লইতে গেলে তিনি কহিলেন—“চৈত্র মাসে শ্রীবৃন্দাবন যেয়ে তুমি আমার সহিত দেখা কর্‌বে।” শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—“মহারাজ, সে সময় ত আমার কোন ছুটী নেই; তখন আমার যাওয়া কি সম্ভব হ্‌বে? তবে আপনি কৃপা ক’রে যদি টেনে নেন, তা হ’লে হ’তে পারে। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ কহিলেন—“শ্রীশ্রীহনুমানজী তোমাকে নিশ্চয়ই টেনে নেবেন।”

মেলাস্থান নদীর চড়ায়। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ সঙ্গে করিয়া মেলাস্থানে একটি গাভী আনিয়াছেন। শীত খুব পড়িয়াছে। তিনি নিজের গায়ের কম্বলখানা ঐ গাভীটির গায়ে জড়াইয়া দিয়া নিজে খালি গায়ে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রীযুত গোস্বামী প্রভুর এক শিষ্য শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কহিলেন—“বাবাজী মহারাজ, পশু-পক্ষী ত খালি গায়েই থাকে। আপনি গায়ের কম্বলখানা গাভীটিকে দিয়ে এই অসহ্য শীতে খালি গায়ে আছেন কেন?” শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—“বাবা, বড় শীত পড়েছে, গাভীটীর বড় কষ্ট হচ্ছে, তাই একে কম্বলখানা দিয়েছি।

আমার ত ধুনি রয়েছে, গায়েও রজ মাখি, কাজেই কোন কষ্ট হয় না।” শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মিত্র—“একে এত দূর না এনে শ্রীবৃন্দাবন রেখে আস্‌লেই ত পার্‌তেন।” শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—“আমি কি আর ইচ্ছা ক’রে এনেছি? আমি ত শ্রীবৃন্দাবন হ’তে রেল গাড়ীতেই এখানে আস্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু গাভীটি যখন বল্লে, আমার সঙ্গে কুম্ভমেলায় আসা তার একান্ত ইচ্ছা, তখন আর কি ক’রে তাকে ফেলে আসি? তাই তাকে নিয়ে হাটাপথে মেলায় এসেছি। এতে আমার কোনই কষ্ট হয়নি।” মানুষ যখন সাধনবলে অতিমানুষ হন, পশুর দুঃখও তখন তাঁহার প্রাণে বাজে—তার কথা তখন তিনি বুঝ্‌তে পারেন।

একদিন শ্রীযুক্ত অভয় বাবু কাঠিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহারাজ, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের মত ভক্ত কি আজকালকার দিনে হয়?” তিনি উত্তর করিলেন—“হাঁ হয়।” শ্রীযুত অভয় বাবু—“এই মেলায় কি এমন কেহ এসেছেন?” কাঠিয়া বাবা—“হাঁ, অনেক এসেছেন। এর চাইতে বড়ও অনেক এসেছেন; কিন্তু তোমাদের চোখ্ কোথায় যে দেখ্‌বে? দেবতারা পর্য্যন্ত এখানে এসেছেন। ভগবান নিজে এখানে আছেন।” তারপর মেলা ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

চৈত্র মাসে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুত অভয় বাবুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে কাঠিয়া বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি কত কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে বড়ই নিরাশ হইলেন। বাবাজী মহারাজ কিনা সাধারণ লোকের ন্যায় হাটে যান, বাজার করেন! বাজারে গিয়াও ভয়ঙ্কর দাম দস্তুর করিয়া জিনিষ কিনেন। অন্য কাউকে বাজারে পাঠাইলে হিসাব নেওয়ার বেলা বড়ই কড়াক্কর—যেন সন্দেহ—আর সন্দেহ। রাস্তায় বসিয়া যাত্রীর নিকট এক পয়সা ভিক্ষা করেন, যখন তখন রাগ প্রকাশ করেন, সামান্য কারণেই চেলাদের যা তা বলিয়া গালাগাল করেন, কখনও বা চিমটা দ্বারা মারিয়াই বসিলেন। কোথায় বাবাজী মহারাজকে সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন দেখিবেন—আর এ কিরূপ? ধর্ম্ম-আলোচনার নামটি নাই। আলাপ আলোচনা যাহা হয় সবই বাজে কথা নিয়া। এসব দেখিয়া শুনিয়া শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় ত অবাক। এই কি তাঁহার বড় সাধের বড় আশার মহাপুরুষ! এঁরই পায় নিজেকে ঢালিয়া দিবেন মনে করিয়াছিলেন!

ইনি যে সাধারণ হইতেও সাধারণ। পূর্ব্বে কুম্ভমেলায় শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ ধারণা করিয়া-

ছিলেন এখন সে সকল ধারণাই উলট্ পালট্ হইয়া গেল।

আশ্রমেরই বা কি বাহার! ছোট্ট একটি কুঠরীতে হনুমানজীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই কুঠরীর দুই পাশে আরও দু'টি ছোট কুঠরী। নানা রকমের সাপের বাসস্থান ঐ কুঠরীগুলি। কাজেই ইহাকে ঠাকুর মন্দির না বলিয়া সাপের আস্তানা বলিলেও বোধ হয় চলে। একটি ভীষণ বিষাক্ত সাপ অনেক সময়ই হনুমানজীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ একটা লাঠির আগায় কতকগুলি ছেঁড়া কাপড় জড়াইয়া রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে উহা দ্বারা হনুমানজীর উপর হইতে এ সাপটাকে ঠেলিয়া নামাইয়া দেন; তৎপর ঐ প্রস্তর মূর্ত্তিতে একটু সিন্দূর মাখাইয়া পূজা করেন; এই তো তাঁহার পূজা অর্চ্চনা! তবে আশ্চর্য্য এই যে, শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ ঐ সব সাপের মাঝেই রাত্রি বাস করেন। সাপগুলি যেন তাঁহার বড়ই আদরের বন্ধু—তাই কিছুই করে না। তাঁহার আর একটি নিয়ম ছিল, প্রতিদিনই নিজ হাতে আশ্রমে যে সকল গাছ লতা প্রভৃতি ছিল তাহার গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া এবং জল দেওয়া। খাওয়ার পূর্ব্বে নিজের রুটী হইতে কতকটা রুটী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চড়ুই পাখীদের খাইতে দেন। আশ্রমে

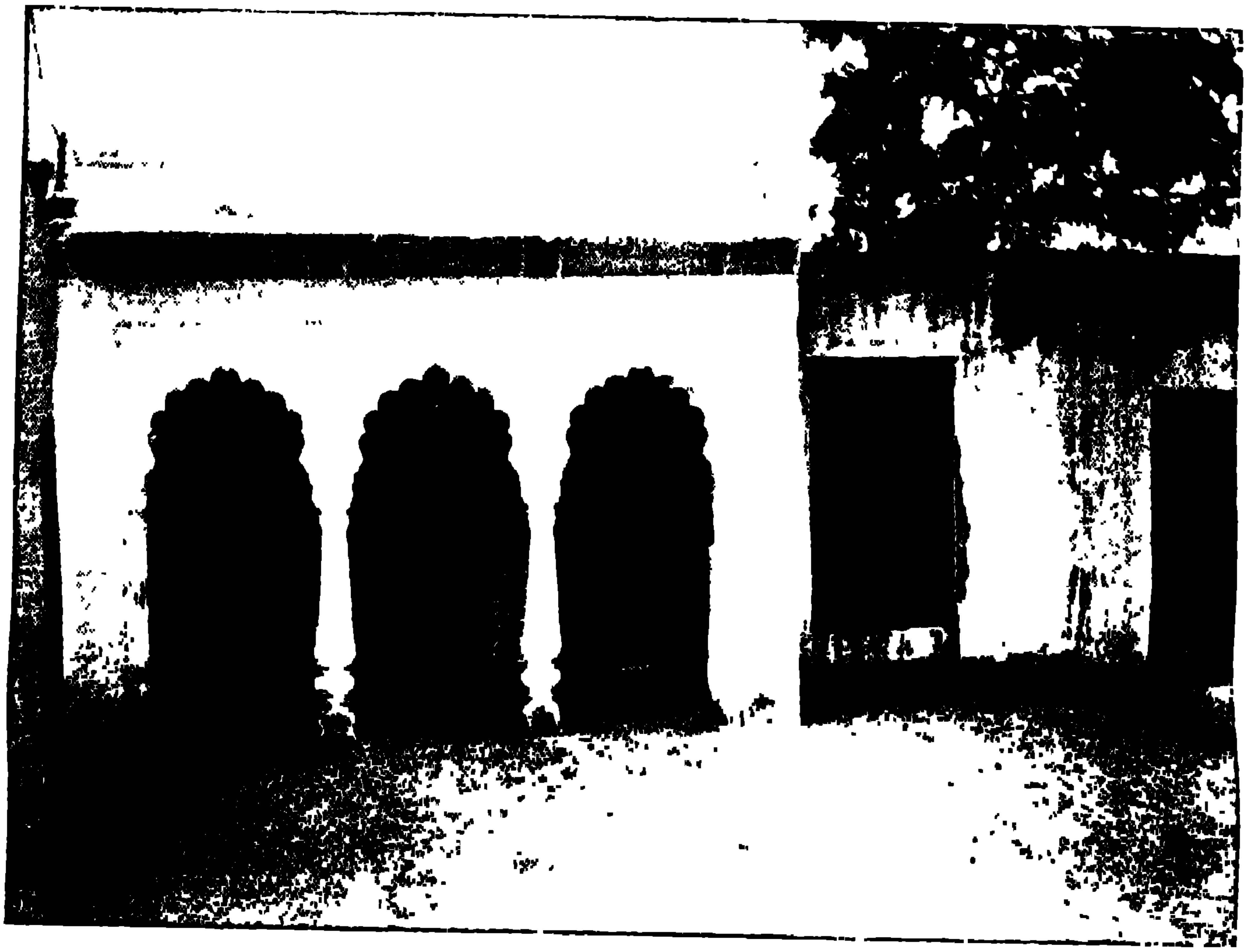

কাঠিয়া বাবার আশ্রম (৬৩ পৃষ্ঠা)

খাওয়ার কোন জিনিষ আসিলে সবাইকে ভাগ করিয়া দেওয়া চাই। সামান্য হইলে তিল তিল করিয়াও সবাইকে দিতেন এবং নিজে খাইতেন।

আশ্রমে একটী ঘোড়া ছিল। একদিন ঘোড়াটা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাবাজী মহারাজ ত অস্থির—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন! দুপুর রৌদ্রে বন জঙ্গল মাঠ ঘাট ঘোড়াটার জন্য টো টো করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান—ঘোড়াটা মিলিল না। আশ্রমে ফিরিয়া বড়ই দুঃখ করিতে লাগিলেন। সাধু হইয়াছেন, একি! সাধু মহাপুরুষেরা কোন জিনিষ হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমলই করেন না, আর উনি কিনা ঘোড়াটার জন্য বনে জঙ্গলে ঘুড়িয়া বেড়ান! প্রায় তিন সপ্তাহ শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বন্ধু সঙ্গে আশ্রমে কাটাইলেন।

আশ্রমে তখন শ্রীযুত গরীবদাসজী, মৌনীজী, কল্যাণ দাসজী ও পুষ্কর দাসজী নামে সাধুরা বাস করিতেন। যাহা হউক তিনি ত বাবাজী মহারাজের আচার ব্যবহার দেখিয়া যারপরনাই ভাবনায় পড়িলেন। কারণ বাবাজী মহারাজের বাহিরের ব্যবহার তো এই রকমের, আবার কুম্ভমেলার সময় যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ইহার মিলই বা কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে

হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন, তখনও ত কেহই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের আচার-ব্যবহারও যদি ঐরূপই হইয়া থাকে, তবে তো বাহিরের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া তাহা বুঝা সহজ হইবে না; এ যে আরো ভাবনার কথা। ইহাই যে ঠিক তাহারই বা প্রমাণ কি? তিনিই যে সেইরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ না পাইলে তাঁহার পায়েই বা কি করিয়া আত্মসমর্পণ করা যায়? এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার মন দোলায়মান হইতে লাগিল; অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বাবাজী মহারাজ যদি সেইরূপ মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, তবে তো তিনি তাঁহার মনের সকল সন্দেহই জানিতে পারিতেছেন, এবং ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা মিটাইয়া দিতে পারেন। অতএব এ সম্বন্ধে এখন নীরব থাকাই উচিত। কিছু তাড়াহুড়া না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া যাওয়াই উচিত স্থির করিলেন। ইহার দু'তিন দিন পর একদিন তিনি তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে বাবাজী মহারাজের কাছে বসিয়া আছেন। ডাকে একখানা চিঠি আসিল। চিঠিখানা শ্রীযুত হরিনারায়ণ বাবুর লেখা। পত্রে শ্রীযুত হরিনারায়ণ

বাবু, শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লইয়াছেন কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। কি জানি কেন বাবাজী মহারাজ পত্রে কি লেখা আছে জানিতে চাহিলেন। তাঁহাকে পত্রের কথা জানাইলে, তিনি কহিলেন—"হাঁ, তাকে লিখে দাও আমার নিকট তার দীক্ষা হ'য়ে গেছে।" তারপর শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"এখন তোমাকে দীক্ষা দেব না; শ্রাবণ মাসে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসো, তখন তোমাদের দু'জনকে দীক্ষা দেব।" এই কথায় তিনি তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। বাবাজী মহারাজের উপর ত আর এখন তেমন শ্রদ্ধাভক্তি নাই, কাজেই তখনই দীক্ষা দিলে বিপদ্ ছিল আর কি? যাহা হউক এখন ত কয়েক মাসের জন্য সময় পাওয়া গেল; তারপর চিন্তা করিয়া যাহা ভাল হয় দেখা যাইবে।

আশ্রমে থাকাকালীন বাবাজী মহারাজের ব্যবহারে বেশ একটু পার্থক্য দেখা যাইত। তিনি শ্রীযুত অভয় বাবুকে স্নেহের সহিত কোমলভাবে ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার প্রতি যেন একটু কঠোর ভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু আজ বাবাজী মহারাজের নিকট বিদায় লইতে গেলে, তিনি শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের দিকে এমনি

ভাবে তাকাইলেন,—যে আজ আর তাঁহাকে কঠোর মনে হইল না। তিনি যেন তখন দয়া ও স্নেহের সাগর, তাঁহার সেই চাহনিতে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল—সমস্ত শরীর মধুময় হইয়া গেল।

নয়

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বাবাজী মহারাজ কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শেষ রাত্রিতে নিদ্রিত না থাকা একটি। তিনি কলিকাতা ফিরিয়া এই উপদেশটি পালন করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু অনেক সময় কৃতকার্য্য হইতেন না, আবার কখনও কখনও শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেও সমস্ত দিন মাথা গরম থাকিত। যাহা হউক ইহা লইয়া কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আষাঢ় মাস, জানালার কাছে মশারী খাটাইয়া ঘুমাইয়া আছেন; শেষ রাত্রে ঘুমটিও খুব গাঢ় হইয়াছে, এমন সময় কে যেন একটি ছোট ঢিল তাঁহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া কহিল—"উঠ।" তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু জানালার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মশারীটাতেও ছেঁড়া ফুটো কিছুই নাই, ঢিলটি যে কি করিয়া ইহার ভিতর ঢুকিল, তাহাও বড় আশ্চর্য্য। অন্য একদিন ছাদের উপর শুইয়া আছেন। শেষ রাত্রে কে যেন দুই তিনবার তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও

নাই—অথচ কাহার স্পষ্ট ডাক শুনিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি এক মন্ত্র পাইয়াছিলেন এবং সে মন্ত্র জপ করিলেই সদ্‌গুরু লাভ করিবার কথা। তিনি সর্ব্বদাই এই মন্ত্র জপ করেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সদ্‌গুরু লাভ হইল না বলিয়া যারপরনাই মনোদুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কেবলই ভাবনা—কবে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরু তাঁহাকে কৃপা করিবেন। দিনের বেলায় ওকালতির কাজকর্ম্ম করেন কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতেই কেবল সদ্‌গুরু লাভের চিন্তা। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ শ্রাবণ মাসে যাইয়া তাঁহাকে দীক্ষা লইতে বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উপর এখন ত আর তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি নাই, কাজেই তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়া কি করিয়া হইতে পারে? ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা অধিক দিন অপূর্ণ রাখেন না। কাজেই তাঁহারও মনোবাঞ্ছা—সদগুরুর আশ্রয় লাভ করা—অপূর্ণ রহিল না। বড় আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত উপায়ে ভগবান্ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন।

আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিয়াছে। একদিন রাত্রে তিনি সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীর ছাদের উপর শুইয়া আছেন। শেষরাত্রে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম্. এ., বি. এল্. (হাইকোর্টে ওকালতী করা
সময়ের ফোটো) (৭০ পৃষ্ঠা)

তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঠিক সেই সময় শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ আকাশ হইতে সেই ছাদে নামিয়া আসিলেন এবং তাঁহার কাছে গিয়া কাণে একটি মন্ত্র দিয়া তখনই শূন্যে উড়িয়া গেলেন। সে সময় শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুরও মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইলেন। কি আশ্চর্য্য! কোথায় বৃন্দাবন—আর কোথায় কলিকাতা!

এইরূপে দীক্ষা পাইয়া বাবাজী মহারাজের প্রতি তাঁহার যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল—তাহা তিরোহিত হইল। মন্ত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁহার মনে হইল, সেই মন্ত্র তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে।

তাঁহার আর শ্রীবৃন্দাবন যাইতে অনিচ্ছা রহিল না। তিনি মনের আনন্দে শ্রাবণ মাসের শেষভাগে শ্রীযুত অভয় বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও বড় বৈমাত্র ভাইকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের আচার ব্যবহার এবারও ঠিক পূর্ব্বেরই মত দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ইহাতে কোনরূপ চিন্তা বা ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইল না। তিনি বুঝিলেন, যিনি শত শত মাইল দূরে বসিয়া তাঁহাকে অদ্ভুত উপায়ে দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার এই সব ব্যবহার লীলা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহাদের স্বামী স্ত্রী উভয়কে দীক্ষা দিবেন বলিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আমার ত পূর্ব্বেই দীক্ষা হ'য়েছে, কাজেই আমার আর দীক্ষার প্রয়োজন কি?" শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—"তা হোক্, পুনরায় দীক্ষা দেব।" জন্মাষ্টমীর তখনও ৮।১০ দিন বাকী; এদিকে তাঁহার স্ত্রীর মনের ভাব অন্যরূপ; তিনি দীক্ষা লইতে ইচ্ছুক নহেন; কারণ কুলগুরুর নিকট তিনি যে দীক্ষা পাইয়াছেন—তাহাতেই আনন্দ পাইতেছেন; শ্রীযুত অভয় বাবু এই কথা জানিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা লওয়া উচিত বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় কিছুই বলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, বাবাজী মহারাজ যখন বলিয়াছেন, স্বামী স্ত্রী উভয়কে দীক্ষা দিবেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষাও হইবে।

জন্মাষ্টমীর দিন সকালে বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে তুলসী মালা, গোপীচন্দন, নূতন কাপড় কিনিয়া আনিতে বলিলেন। টাকা আনিতে তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট গেলে, তাঁহার স্ত্রী কহিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে দীক্ষা নেব। মালা, চন্দন, কাপড় আমার জন্যও আনিবে।" তিনি হাসিয়া কহিলেন—"সেকি? তুমি না দীক্ষা নেবে না বলেছিলে?" তাঁহার স্ত্রী—"হাঁ, আমি ত সেইরূপই মনে করেছিলুম, কিন্তু

শ্রীশ্রীঅন্নদা দেবী (শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী)

জন্ম—সাল ১২৬৯ ; মৃত্যু—সাল ১৩৩৬। (৭২ পৃষ্ঠা)

আজ সকাল হ'তে কি জানি কেন দীক্ষার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।" মহাপুরুষের বাক্য কি মিথ্যা হইতে পারে ?

যথাসময়ে বাবাজী মহারাজ তাঁহাদের উভয়কে দীক্ষা দিলেন। প্রথমে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের কাণে একটি মন্ত্র দিয়া কহিলেন—"এই মন্ত্র সদা-সর্ব্বদা জপ কর্‌বে।" তার পর পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাদের উপর যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় বলিয়া দিয়া কহিলেন এই মন্ত্র জপ কর্‌তে হবে না, সময়ে আপনা হ'তেই ইহা ফুটে উঠ্‌বে। ইহার জপ আপনা হ'তেই হয়।" তারপর তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষা হইল। এইরূপে ১৩০১ সালের ভাদ্র মাসে শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে তাঁহারা উভয়ে বাবাজী মহারাজের কৃপা প্রাপ্ত হইলেন।

মহাপুরুষদের কার্য্য বোঝা কঠিন। তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া বুঝিতে না দেন তবু তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারে কার সাধ্য।

পুষ্করদাসজী নামে এক সাধু প্রায় ২০ বৎসর কাল বাবাজী মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এত কাল সেবা করিয়াও তাঁহার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বাবাজী মহারাজও

পুষ্করদাসজীর নিকট নিজকে এতটুকু প্রকাশ করিলেন না। শুনিয়া তোমরা আশ্চর্য্য হইবে, পুষ্করদাস বাবাজী মহারাজকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার ভাঙ্গের সঙ্গে সেঁকো বিষ মিশাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন ; তিনি যোগীশ্বর—এ বিষ তাঁহাকে কিছুই করিতে পারিল না ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে অন্য তিন জন মোহন্ত ঐ ভাঙ্গ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন নিজের কমণ্ডলুর জল দ্বারা তাঁহাদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। সুস্থ হইয়াই তাঁহারা পুষ্করদাসজীকে পুলিশে দিতে চাহিলেন,কিন্তু বাবাজী মহারাজের সে ইচ্ছা নয়, তিনি কহিলেন,—"তোমরা ত সকলেই সুস্থ হয়েছো। পুষ্করদাস যা ক'রেছে, তার ফল সে অবশ্যই ভুগ্‌বে ; কাজেই সাধু হ'য়ে তোমরা পুলিশের নিকট যাবে কেন ?" কিন্তু তাঁহারা জেদ করিতেছেন দেখিয়া বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"তোমরা আমার কথা না শোন, পুলিশে যেতে পার, কিন্তু তাহার কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। আমি পুলিশের নিকট বল্‌বো, এই ভাঙ্গ তোমাদের চাইতে আমিই বেশী খেয়েছি, এবং আমার কিছুই হয় নাই। কাজেই তোমাদের নালিশে কিছুই হবে না।" মোহন্তেরা আর কি করেন, তাঁহাদের ঐরূপ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল।

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের কোমরে কাঠের আড়বন্ধ ছিল,

তাহা পূর্ব্বে তোমাদের বলিয়াছি। এই আড়বন্ধটি গোলাকার। ইহার দুই দিকে শিকল দ্বারা কাঠের ল্যাঙ্গট জোড়া থাকে। পুষ্করদাস মনে করিতেন ঐ কাঠের আড়বন্ধের মধ্যে নিশ্চয় মোহর আছে। তাঁহাকে মারিয়া এ মোহর পাওয়া চাই। অতএব রুটীর সঙ্গে পুনরায় বিষ দিলেন; কিন্তু বাবাজী মহারাজ মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ—বিষ এবারও তাঁহাকে কিছু করিতে পারিল না; এবং তিনিও কাহাকে কিছু বলিলেন না। দুই দুইবার তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, পুষ্করদাস তাঁহাকে মারিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। বাবাজী মহারাজ ঘুরিতে ঘুরিতে একবার আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। একদিন রাত্রে তিনি একটা উঁচু ঢিপির নীচে শুইয়া আছেন। পুষ্করদাস কয়েকজন চোরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া প্রায় দু'মন ভারী একটা পাথর দু' তিনজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহার উপর ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার ডান হাতে খুবই লাগিল; কিন্তু তিনি কাউকে কিছুই বুঝিতে না দিয়া লাঠি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চোরেরা মনে করিল,—পাথর তাঁহার উপর পড়ে নাই, তাই তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা পলাইয়া গেল কিন্তু পুষ্করদাজসী পলাইলেন না এবং তিনি যেন এসব ব্যাপারের কিছুই জানেননা, এইরূপ ভাণ

করিলেন। বাবাজী মহারাজও তিনি যে সবই জানেন, এ কথা বুঝিতে না দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। এতেও পুষ্করদাসের চোখ্ ফুটিল না। তিনি আর একবার বাবাজী মহারাজকে বিষ দিলেন। এইবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পেট ফুলিয়া উঠিল। তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া কোমরের কাঠের আড়বন্ধ কাটা হইল ; কিন্তু পুষ্করদাসজীর বিষ দেওয়ার কথা তখনও কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। একব্যক্তি শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়কে বাবাজী মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ "টেলি" করিয়া জানাইলেন। শ্রীযুত অভয়বাবুর মুখে :বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বাবাজী মহারাজের অসুখের খবর শুনিয়া কহিলেন—"তিনি যোগীশ্বর, তাঁহার শরীর সিদ্ধ। কোন রোগই তাঁহার হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই কেহ তাঁকে বিষ দিয়ে থাক্‌বে।"

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় টেলি পাইয়াই শ্রীযুত অভয়বাবুকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

তাঁহারা বৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছিয়া শুনিলেন, গোস্বামী প্রভুর কথাই ঠিক। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"হাঁ বাবা, পুষ্করদাস এবারও আমাকে রুটীর সঙ্গে দুই তোলা

শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ (৭৬ পৃষ্ঠা)

আন্দাজ সেঁকো বিষ দিয়েছে। এখন বৃদ্ধ হয়েছি তাই বিষ আমার শরীর খারাপ করতে পেরেছে।" গোস্বামী প্রভুর কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি কহিলেন—"দেখ, কলিকাতা ব'সেই মহাপুরুষেরা এখানকার খবর পান।"

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের কথা শুনিয়া, তাঁহারা ত অবাক্! পুষ্করদাস তখনও আশ্রমেই আছে। ডাক্তার তাঁহার পথ্যের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও পুষ্করদাসই তৈয়ার করিয়া দিতেছে। ব্যাপার মন্দ নয়। তিন তিনবার বিষ দেওয়া সত্ত্বেও পুষ্করদাস আশ্রমেই আছে!

এই ব্যবস্থা তাঁহাদের মোটেই ভাল লাগিল না। শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বাবাজী মহারাজকে বলিলেন—"মহারাজ, তিন তিনবার পুষ্করদাস আপনাকে বিষ দিয়েছে—অথচ সে এখনও আশ্রমেই আছে এবং আপনার পথ্য তৈরী কর্‌ছে, এ আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমাদের ইচ্ছা পুষ্করদাসজীকে আশ্রম হতে সরিয়ে দেওয়া হউক।" শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—"বাবা! পুষ্করদাসের ভুল এবার ভেঙ্গে গেছে। সে মনে কর্‌তো আমার কাঠের আড়বন্ধের ভিতর অনেক মোহর আছে এবং আমাকে মেরে সে উহা নেবে। এখন ত উহা কাটা হ'য়েছে, কাজেই তার ঐ ভুলও ভেঙ্গেছে। তবে তোমার ইচ্ছা হ'লে তাকে আশ্রম হ'তে

এখনই সরিয়ে দিতে পার।” এই কথা শুনিয়া তিনি ভাবনায় পড়িলেন। তিনি আশ্রমে থাকেন না,—সেখানে নূতন লোক—কি করিয়া পুষ্করদাসকে চলিয়া যাইতে বলেন! শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া নিজেই ঐ স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া পুষ্করদাসজীকে বলিলেন—“তোমার রান্না কোন কাজেরই হয় না। প্রায়ই তরকারীতে নুন বেশী হয়। তা ছাড়া তুমি আমাকে কয়েকবার বিষও খাইয়েছ। তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। কালমুখ করে এখান হ’তে বের হ’য়ে যাও।” পুষ্করদাসজী আর কি বলিবেন, তিনি তখনই আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সাধু মহাপুরুষদের নিকট শত্রু মিত্র সমান। পুষ্করদাস এত সব কাণ্ড করা সত্ত্বেও বাবাজী মহারাজ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলার সময় যেরূপ ভাবে কথা বলিলেন, তাহাতে যেন মনে হয় বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমরা হইলে এ অবস্থায় কি না করিয়া বসিতাম। কিন্তু বাস্তবিকই যাঁহারা সাধু মহাপুরুষ—তাঁহাদের আচার-ব্যবহার এইরূপই বটে।

পুষ্করদাসজী চলিয়া যাওয়ার পর, মৌনীজী যাঁহার কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি—রান্নার ভার লইলেন। কিন্তু বাবাজী মহারাজের খাওয়াতে রুচি নাই। ডাক্তারের ঔষধেও

কোন কাজ হইতেছে না। অবশেষে ডাক্তার বলিলেন—"তিনি খুব গাঁজা চরস খান, তাই ঔষধে কাজ হয় না।" বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"বেশ ত, তুমি বল্লে, এখনই গাঁজা চরস খাওয়া ছেড়ে দিতে পারি।" ডাক্তার এই কথায় সায় দিলেন। তাহাতে বাবাজী মহারাজ তখন হইতেই গাঁজা ও চরস খাওয়া ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই অভ্যাস বড় কম দিনের ছিল না, শত বৎসরের। সামান্য কয়দিনের অভ্যাস আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, আর তিনি কিনা শত বৎসরের অভ্যাস এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিলেন। মহাপুরুষদের সমস্তই অদ্ভুত।

জন্মাষ্টমীর পর সাধুরা ব্রজে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করিয়া থাকেন, সে কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। একবার শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বাবাজী মহারাজের সঙ্গে পরিক্রমায় গিয়াছেন। বর্ষাণা নামক গ্রামে এক পাহাড়ের উপর প্রিয়াজীর মন্দির অবস্থিত। তাঁহারা ঐ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পিরীপুকুর আসিলেন। সাধুরা অনেকেই যাইয়া ঐ মন্দিরে প্রিয়াজীকে দর্শন করিয়া আসিলেন কিন্তু শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি মনে করিলেন, পরদিন সকলে যখন যাত্রা করিবে সে সময় তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া

প্রিয়াজীকে দর্শন করিয়া আসিবেন। পরদিন যথাসময়ে সকলেই যাত্রা করিল, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে গাভীটি ছিল, তাহাকে কেহই লইয়া যায় নাই। তখন তিনি ঐ গাভীটিকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। ঐ পাহাড়ের নীচে আসিলে, প্রিয়াজীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার খুব আগ্রহ হইল; কিন্তু গাভীটিকে ফেলিয়া কি করিয়া যান? তখন তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন; ভগবান লাভ করিয়াই ত প্রিয়াজীর মাহাত্ম্য। আমার গুরুদেবও ভগবান লাভ করিয়াছেন, কাজেই তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইয়া তাঁহার দর্শন করিলেই ত হয়। এই মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখেন বাবাজী মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি "এসো" "এসো" বলিয়া ডাকিলেন; তখন শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হা বাবা, প্রিয়াজীর দর্শন আর সাধু দর্শন একই, এতে ভেদ নাই।" বাবাজী মহারাজ অন্তর্য্যামী, কাজেই ঐ কথা বলিয়া পূর্ব্বেই তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা আরও দৃঢ় করিয়া দিলেন। তারপর বাবাজী মহারাজ তাঁহার অন্য চেলা গরীবদাসজীর গুরুভক্তি সম্বন্ধে গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুভক্তির তুলনা

হয় না। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ কত রকমে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। একবার গরীবদাসজী পরিক্রমার সময় অনেক রাস্তা চলার পর, রান্না করিয়া সন্ধ্যার পর ভোগ লাগাইয়া সাধুদের প্রসাদ দিলেন। বাবাজী মহারাজের জন্য পৃথক্ রুটী পাত্‌লা করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি রুটীতে হাত দিয়াই তাহা কাঁচা আছে বলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং মস্ত বড় এক লাঠির দ্বারা মাথায় আঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গরীবদাসজী মাটীতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মাথা হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু তখনই গরীবদাসজী উঠিয়া জোড়হাতে বলিলেন—"বাবাজী মহারাজ, আমার অন্যায় হ'য়েছে, আমি আবার ভাল ক'রে রুটী তৈরী করে দিচ্ছি।" তখন কি আর বাবাজী মহারাজ স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহার বড় দুঃখ হইল। তিনি তাঁহার বড় আদরের চেলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিন দিন খাইতে পারিলেন না। মহাপুরুষদের বাহিরের কঠোরতার সঙ্গেও ভিতরে যে কি অসীম প্রেম-সমুদ্র বিদ্যমান থাকে, তাহা আমরা কি বুঝিব!

দশ

তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবানকে পাইতে হইলে এমন গুরু চাই, যিনি নিজে ভগবান লাভ করিয়াছেন। এইরূপ পুরুষকে এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায়। অদৃষ্টগুণে কাহারো এইরূপ গুরু লাভ হইলে তাঁহার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়, এবং গুরু সকল সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত রকম অভাব অসুবিধা দূর করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের একবার খুব জ্বর হয়। তখন তিনি কলিকাতার "হাইকোর্টে" ওকালতি করেন। তাঁহার মনে হইল, শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ গাঁজা খান, তাঁহাকে গাঁজা ভোগ দিয়া যদি সেই প্রসাদ পান, তাহা হইলে তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। এই মনে করিয়া তিনি শ্রীযুত বাবাজী মহারাজকে গাঁজা ভোগ দিলেন এবং নিজে সেই গাঁজা খাইলেন। গাঁজা খাওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস ছিল না; কিন্তু সেই প্রসাদী গাঁজা যথেষ্ট পরিমাণ খাওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কিছুই হইল না, জ্বর ছাড়িয়া গেল।

কয়েক মাস পরে তিনি বৃন্দাবনে যান। তাঁহার সেখানে থাকিবার সময় শেষ হইলে তিনি কলিকাতায় ফিরিবার দিন

স্থির করিলেন। রওয়ানা হইবার কিছু সময় পূর্ব্বে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ গাঁজার কল্কি হাতে দিয়া বলিলেন—"এ প্রসাদী গাঁজা, তুমি খাও।" সেখানে কয়েকজন ব্রজবাসী বসিয়াছিল, এত সময় শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তাঁহাদের সঙ্গেই গাঁজা খাইতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল —"বাবু কি গাঁজা খান?" শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—"না, বাবু গাঁজা খান না বটে; তবে জ্বর হ'লে আমাকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পান।" ভাবিয়া দেখ, প্রকৃত সদ্‌গুরুর শক্তি কি অসীম!

কোন কাজে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় একবার অন্য স্থানে গিয়াছেন। সে সময় কলিকাতায় খুব চোরের ভয় দেখা দিয়াছে। খালি বাসায় তাঁহার স্ত্রী চোরের ভয়ে যারপরনাই ভীতা হইলেন। এক দিন রাত্রে খুব গরম পড়িয়াছে; একটু ঠাণ্ডা বাতাস হইলে প্রাণে বাঁচা যায়। জানালা খুলিয়া দিলে বাতাস আসিবে মনে করিয়া তিনি জানালা খুলিতে গেলেন। যেইমাত্র জানালাটি খুলিয়াছেন, দেখেন শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কহিলেন—"মা, ভয় কি? আমি ত সব সময়ই তোমার সঙ্গে আছি। প্রয়োজন হইলে গুরু শিষ্যের দারোয়ানগিরিও করিয়া

থাকেন ; কিন্তু উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হইলেই এ সব সম্ভব হয় জানিবে।”

একবার তাঁহারই খুব জ্বর হইয়াছে। রাত্রিকাল, সকলেই ঘুমাইয়া আছেন। অত্যধিক যাতনায় তিনি খুব কাতর হইয়াছেন। শিষ্যের এই যাতনায় গুরু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তখনই সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া গেল, তিনি কতকটা সুস্থ হইলেন। তিনি তখন শ্রীযুত বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করিবেন মনে করিলেন ; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই বাবাজী মহারাজ অদৃশ্য হইলেন—তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

অন্য এক সময় শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় হাতীর পিঠে চড়িয়া শ্বশুর বাড়ী রওয়ানা হইয়াছেন। হাতীর উপর তিনি আর মাহুত। গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময় একটি ঘটনা ঘটিল। হাতী আপন মনে চলিয়াছে। কিছু সময়ের জন্য তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তারপর হঠাৎ দেখেন তাঁহার নাকের সামনে একটি গাছের ডাল। মাহুত পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়া হাতীর উপর শুইয়া পড়িয়া ডালের আঘাত হইতে বাঁচিয়া

গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার আর সে সময় নাই। ডাল তাঁহার মুখে লাগিবেই এবং তাতে আঘাতও খুবই পাইবেন বলিয়া ভয়ে চোখ বুঝিলেন। হাতীটা সে স্থান দিয়াই গেল বটে, কিন্তু মজা এমনি হইল যে, সেই ডাল তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। কি করিয়া যে এ সম্ভব হইল, মানুষের বিচার-বুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারে না ; যাহা হউক সে আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি ঘটনা যে ঘটিল, তাতো আর অস্বীকার করা চলে না। তারপর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গেলে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ আপনা হইতেই কহিলেন—"বাবা, গাছের ডাল তোমায় কি কর্‌বে ? ভগবান সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমায় রক্ষা কর্‌ছেন।" শিষ্যের বিপদে গুরু কত ভাবেই না তাকে রক্ষা করেন !

শ্রীযুত অভয় বাবুর কথা তোমাদের বলিয়াছি। তিনি একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যান। সেখানে এক ব্যক্তি রেল আফিসে চাকুরী করিতেন ; তিনি তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন। সেই স্থানটী বড়ই নির্জ্জন ছিল—চারদিক পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা ; নিকটেও অন্য কাহারো বাড়ী ঘর ছিল না। একদিন সেই "রেলওয়ে" কর্ম্মচারিটি কোন কাজে অন্যত্র যান। অভয় বাবু একাকী, তাঁহার ঐ নির্জ্জন স্থানে বড় ভয় করিতে লাগিল। সেদিন রাত্রে গরমও

খুব পড়িয়াছে, ঘরে শোওয়া অসম্ভব। কাজেই ভয় করা সত্ত্বেও তিনি বাহিরেই শোওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার পাশে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিলেন শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ। কি আশ্চর্য্য! ইহা দেখিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিবেন মনে করিলেন, কিন্তু তখনই দেখিলেন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আর সেখানে নাই। সেই রাত্রে বার বার তিনবার এই ঘটনা ঘটিল; অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন, তাঁহার সকল ভয় ভাবনাই দূর হইল। তিনি বুঝিলেন, সেই নির্জ্জন স্থানেও শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। এখন দেখ, শিষ্যের জন্য দয়াল গুরু কতই না করেন!

শ্রীযুত অভয় বাবুর কোম্পানীর কাগজ বেচা-কেনার কারবার ছিল। এই কারবারে একবার তাঁহার বহু টাকা ক্ষতি হয়; ফলে তাঁহার বহু টাকা ঋণ হইল। পাওনাদারগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে টাকার জন্য তাড়া দেয়, শোধ করিবারও উপায় নাই; ভীষণ মনোকষ্টে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। অবশেষে মনের দুঃখে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ই শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ অযাচিতভাবে শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় (৮৬ পৃষ্ঠা)

তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। তারপর তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে অযোধ্যায় উপস্থিত হন। তাঁহার মনে এতটুকু শান্তি নাই—কেবল দুর্ভাবনা—আর দুর্ভাবনা! অভাব অনাটনের জ্বালা, তা'ছাড়া বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া এইরূপ পলাইয়া পলাইয়া আর কত দিনই বা কাটিবে। তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবনের সকল রকম আশা আকাঙ্ক্ষাই তিরোহিত হইল। এ জীবন তাঁহার নিকট বড়ই নির্ম্মম এবং কষ্টকর মনে হইতে লাগিল। এই দুঃখময় জীবনের মূল্যই বা কি? এর শেষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই মনে করিয়া পর দিন সরযূ নদীর পুল হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবেন ঠিক করিলেন। রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছেন, শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং খুব ধমক দিয়া কহিলেন—"তুমি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবে, আর ভগবান তোমাকে দর্শন দে'বেন? আমি তোমায় ভগবৎ নাম দিয়েছি, তা তুমি জপ করনা কেন? ভগবানকে বুঝি এমনি পাওয়া যায়?" এই বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন। কিছু সময় পর শ্রীযুত অভয় বাবু দেখিলেন, সমস্ত পৃথিবী যেন এক জ্যোতিঃতে ভরিয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে কি আনন্দ! তিনি সেই জ্যোতিঃসমুদ্রে আনন্দে ভরপূর হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। ভগবান নাই তাঁহার এই সন্দেহ দূর হইল।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যান। তখন বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"কিহে, ভগবান আছেন, এখন বিশ্বাস হয়েছে ত? আচ্ছা, তুমি কলিকাতা যাও, তোমার আর কোন চিন্তা নেই। পাওনাদারগণ তোমায় আর উৎপাত কর্‌বে না!" তারপর তিনি কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পাওনাদারগণ তাঁহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎপাত করিল না।

একবার তিনি গয়ায় বাস করিতেছিলেন। একদিন রাত্রে বাবাজী মহারাজ স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন—"এই দেখ একজন মহাপুরুষ, তুমি এঁর সঙ্গ কর্‌বে, তাতে তোমার কল্যাণ হ'বে।" তারপর তিনি বৃন্দাবনে যান, সেখানে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি দেখিলেন—এই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ। বাবাজী মহারাজের স্বপ্নাদেশ অনুসারে তিনি গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন যমুনার তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তখন তিনি বাবাজী মহারাজকে বলিলেন—"মহারাজ, গয়া থাকাকালীন স্বপ্নে আপনার দর্শন পেয়েছিলুম।" বাবাজী মহারাজ—"হাঁ, আমি তোমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলুম; এখন ত তোমার স্বপ্ন সত্য বলে বুঝতে পার্‌ছ; সেই মহা-

পুরুষের সঙ্গেই ত তুমি বাস কর্‌ছ। ইনি যথার্থই সাধু, ইঁহার সঙ্গ কর্‌লে তোমার ভাল হ'বে। চল, আমিও তোমার সঙ্গে তাঁহার নিকট যাই।" তাঁহারা উভয়ে গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তখনকার ব্যবহার বড় অদ্ভুত রকমের, যেন কেহই কাহারো নিকট পরিচিত নহেন। শ্রীযুত অভয় বাবু ত তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। গোস্বামী প্রভু বলিতেন—"গর্গ, নারদ প্রভৃতি যে স্তরের লোক, বাবাজী মহারাজও সেই স্তরের।"

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ যে শুধু তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গেই নানারূপ লীলা করিতেন তাহা নহে। শিষ্য ছাড়া অন্য ব্যক্তিও আশ্চর্য্য ভাবে কখনও কখনও তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের এক বিশেষ বন্ধুর একবার অসুখ হয়। তাঁহার নাম শ্রীযুত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়; তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য সাঁওতাল পরগণার কোন স্থানে গমন করেন; তথায় তাঁহার বাড়ীর নিকটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাবাজী মহারাজকে তিনি দেখিতে পান। তিন দিন বাবাজী মহারাজ সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যহই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং বাবাজী মহারাজও তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তৎপর তিনি কলিকাতা আসিলে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের

বাসায় যান। সেখানে তাঁহার বসিবার ঘরে মাথার উপরে বাবাজী মহারাজের একখানা ফটো টাঙ্গান ছিল। তিনি ঐ ফটো দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি এই মহাপুরুষের দেখা কোথায় পেলেন?" শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"ইনি আমার গুরুদেব।" শ্রীযুত বিহারী বাবু—"আমি সম্প্রতি ইঁহাকে সাঁওতাল পরগণায় দেখে এসেছি। তিন দিন তিনি আমার বাড়ীর নিকট এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে আসন করেছিলেন।" কিন্তু সে সময় বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার তখন অন্য কোথায়ও যাওয়ার কথা নয়, কাজেই ওই কথা শুনিয়া শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বিস্মিত হইলেন। তারপর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গেলে, বাবাজী মহারাজকে এই কথা বলিলে তিনি উত্তর করিলেন—"হাঁ, কেউ কেউ অন্য স্থানেও কখন কখন আমার দেখা পায়। ইহার অর্থ এখন তুমি বুঝবে না—পরে বুঝতে পারবে।"

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ একবার কলিকাতায় শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় গিয়াছেন। তখন শ্রীমৎ স্বামী (১০৮) ভোলানন্দ গিরি মহারাজজীও কলিকাতায়। একদিন সন্ধ্যায় বাবাজী মহারাজের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় গিরি মহারাজজীর

দু'জন শিষ্য সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বাবাজী মহারাজকে দর্শন কর্‌বার জন্য গিরি মহারাজজী এসেছেন, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।" সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বাবাজী মহারাজ তাড়াতাড়ি যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। স্বামিজী সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাবাজী মহারাজ উল্টা দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছেন। ইহা দেখিয়া স্বামিজী যোড় হাতে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বাবাজী মহারাজ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং পরম আদরের সহিত তাঁহাকে বিছানায় বসাইলেন। তারপর তাঁহার বিদায়কালে কাঁধে হাত দিয়া এমনি ব্যবহার করিলেন যেন উভয়ে বন্ধু আর কি? অথচ প্রথম আসা মাত্রই যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ইহার যে কোথায় মিল তাহা আমরা কি বুঝিব?

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে কেমারবনস্থিত বাবাজী মহারাজের আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হন। সে সময় খুব উৎসব হইয়াছিল এবং বহু লোক তখন প্রসাদ পাইয়াছেন; কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পরও বহু লাড্ডু, কচুরী বাঁচিয়া গেল। তিন দিন ধরিয়া এই প্রসাদ বিতরিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সাধু

উপস্থিত; তাহারা প্রসাদ পাইতে ইচ্ছুক এই কথা প্রকাশ করিলে বাবাজী মহারাজ ত ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলেন এবং একে একে সকলকেই তাড়াইয়া দিলেন। শ্রীযুত অভয় বাবু এই কাণ্ড দেখিয়া যারপরনাই বিরক্ত হইলেন। ভাণ্ডারে এত সব থাকা সত্ত্বেও কেউ খাইতে চাহিলে তাহাকে তাড়াইয়া দিলে কার না রাগ হয়? শ্রীযুত অভয় বাবু মনে মনে এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন। তিনি ও শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় এক সঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠিক সেই সময় বাবাজী মহারাজ যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন—"অভয়রাম, তোমরা বালক, কিছুই বোঝ না; এরা কেউ সাধু নহে, সবই ভণ্ড। ক্ষিদেও এদের পায়নি—শুধু রোজগার কর্‌বার মৎলবে মিথ্যে কথা বলেছে। বাস্তবিকই যদি ক্ষুধার্ত্ত হোত, আমি কখনই তাড়াতুম না। এখনই এক ক্ষুধার্ত্ত সাধু আস্‌বে, তাঁকে যত ইচ্ছা খেতে দিও।" তাই হইল; দু-তিন মিনিট পরে যথার্থই এক সাধু আসিয়া উপস্থিত; সেই সাধু ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া খাইতেও চাহিলেন।

গোবর্দ্ধনবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আশ্রমে কিছুদিন কার্য্য করেন। তৎপর বাবাজী মহারাজ ব্রজ-পরিক্রমায় বাহির হইলে, ঐ ব্রাহ্মণটি তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আপ্রাণ চেষ্টায়

বাবাজী মহারাজের সেবা করিলেন। ব্রাহ্মণটির হাঁপানি রোগ ছিল; কিন্তু তা সত্বেও সেই সকলের চাইতে বেশী খাটিত। পরিক্রমা শেষ হইলে সকলেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণটির রোগ তখন খুব বাড়িয়া গেল, কাজেই সে আর কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। একদিন সে ধুনীর নিকট বসিয়া আছে, বাবাজী মহারাজ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তুই কেন এখানে প'ড়ে আছিস্? কাজ-কর্ম্মও কর্‌ছিস্ না। ব'সে ব'সে শুধু খাচ্ছিস্। এখনই আশ্রম হ'তে বের হ'য়ে যা।" নিরুপায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর কি করে—তখনই আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া শ্রীযুত অভয় বাবু যারপরনাই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। বেচারা যতদিন পারিয়াছে খাটিয়াছে, আজ আর খাটিতে পারে না, তাই কিনা তাহাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। শ্রীযুত অভয় বাবুর মনে এইরূপ নানা কথা উঠিতেছে, এমন সময় বাবাজী মহারাজ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"দেখ অভয়রাম, তোমরা নেহাৎ ছেলে মানুষ কিছুই বোঝ না। এই ব্রাহ্মণটি খুবই ভাল লোক, কিন্তু এখানে ব'সে ব'সে খেতে পেয়ে সাধন-ভজন সব ছেড়ে দিয়েছে। আবার যদি দুঃখে পড়ে, তবেই ভগবানের দিকে মন ফির্‌বে। খাওয়ার অভাব ওর হবে না—যে ভাবেই হউক, খাওয়া ওর জুট্‌বেই।

প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয় তা তোমরা জান না। আমি ওর ভালর জন্যই আশ্রম হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছি। তখন শ্রীযুত অভয় বাবু ইহার অর্থ বুঝিলেন এবং তাঁহার রাগ ও দুঃখ উভয়ই দূর হইল। মহাপুরুষেরা যে কিসের জন্য কি করেন, তাহা বোঝা বড় কঠিন।

শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার এক মোক্তার শ্রীবৃন্দাবনে যান। একদিন বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য তিনি আশ্রমে উপস্থিত হন। প্রথমেই শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় মোক্তার বাবুটি তাঁহাকে প্রণাম করেন। ঠিক সেই সময় বাবাজী মহারাজের যেন খুব কষ্ট হইতেছে, তাই উঃ আঃ করিতে করিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। রোগের যাতনায় খুবই অস্থির এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মোক্তার বাবুটি তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া যারপরনাই বিচলিত হইলেন; এমন কি প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। দু' একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সেখানে না বসিয়া তখনই চলিয়া গেলেন। মোক্তারটি চলিয়া যাওয়া মাত্রই বাবাজী মহারাজ হাসিতে লাগিলেন এবং নানারকম কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি ভাবে মহাপুরুষেরা কত রকম লুকোচুরি

খেলিয়া থাকেন; তাঁহাদের সঙ্গ করিবার সুযোগও একমাত্র তাঁহাদের কৃপাতেই সম্ভব।

যে মান-সম্মানের জন্য আমরা এত ব্যস্ত, এর জন্য কত কি করিয়া থাকি,—সেই মান-সম্মান মহাপুরুষদের নিকট কতই না তুচ্ছ। শ্রীবৃন্দাবনে একবার এক রাজা আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। তিনি একদিন বাবাজী মহারাজকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যান এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করেন। পরে রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাবাজী মহারাজ ঐ রাজবাড়ী হইতে বাহির হইবেন—নীচে দারোয়ান তাঁহাকে প্রণাম করিল। আর কথা কি—সেখানেই দারোয়ানের কাছে বসিয়া পড়িলেন। এই মাত্র যে তিনি রাজার নিকট এত সম্মান পাইলেন,—তাহা যেন ভুলিয়া গেলেন। ঝুলি হইতে গাঁজার কল্কি বাহির করিলেন এবং দারোয়ানের সঙ্গে পরমানন্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন। মজা আর কি! কোথায় রাজার দেওয়া কত সম্মান—আর তাঁরই বাড়ীর দারোয়ানের সঙ্গে এত ভাব! ইঁহাদের কাজকর্ম্ম এমনি অদ্ভুতই বটে!

বয়সে ছোট্ট এক সাধু ডালিম গাছের পাতা লইতে একদিন আশ্রমে আসিয়াছে। বাবাজী মহারাজ কিছুতেই তাহাকে পাতা লইতে দিবেন না। বলিতে লাগিলেন—

"আমার গাছ ছোট, কিছুতেই আমি তোমাকে এর পাতা দিব না। অন্য স্থান হইতে তুমি পাতা যোগাড় করগে।"

সেই অল্পবয়স্ক সাধুটি, তাঁহার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া একটু কড়া কথাই বলিয়া বসিল—আর যায় কোথায়। বাবাজী মহারাজও তাহার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাধ্য হইয়াই সাধুটিকে চলিয়া যাইতে হইল। তখন বাবাজী মহারাজ যেন ছোট্ট বালকটি—কহিতে লাগিলেন—"আমার গাছের পাতা নিতে এসেছিল, কেমন একে তাড়িয়ে দিয়েছি।" শাস্ত্রে আছে, মহাপুরুষদের এক অবস্থা বালকবৎ।

শরীরে জোর না থাকিলে সর্ব্বত্রই বিপদ্। যে যত দুর্ব্বল, তার উপর লোকে তত অত্যাচার করিয়া থাকে। একবার বাবাজী মহারাজ রেলগাড়ীতে চলিয়াছেন; সঙ্গে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় ও অপর কয়েকজন শিষ্য। তাঁহারা গাড়ীর যে কামরায় উঠিয়াছিলেন তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই দু'জন মুসলমান বসিয়াছিল। কোন কারণে তাহারা একবার নীচে নামিয়া যায়। ইতিমধ্যে সেই স্থানটা খালি দেখিয়া বাবাজী মহারাজকে ঐখানে বসান হয়। কিছুকাল পরে মুসলমান দু'টি আসিয়া উপস্থিত। তাহারা বাবাজী মহারাজকে ঐ স্থানে দেখিয়া ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল।

গায়েও তাদের খুব শক্তি ছিল, কাজেই দেখিতে দেখিতে ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। বাবাজী মহারাজও ঠিক সমান তালে তাদের সঙ্গে গালাগালি বকাবকি করিতে লাগিলেন। কাণ্ড দেখিয়া তাহারা চুপ করিয়া গেল; বেশই বুঝিতে পারিল, তাঁহার সঙ্গে গালাগালি করিয়া পারা যাইবে না; কিন্তু কিছু সময় পরে মুসলমান দু'টি বাবাজী মহারাজকে জব্দ করিবার জন্য এক বুদ্ধি করিল। তাহাদের সঙ্গে মাংসের তরকারী ছিল—তাহাই খুলিয়া খাইতে লাগিল; কিন্তু বাবাজী মহারাজ এত সহজে জব্দ হইবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"বেশ, তা তোমাদের খাদ্য পশুর আহার, তা তোমরা খাও, তাতে আমার কি? আমিও আমার খাবার খাব।" এই বলিয়া তিনি ছুরী দ্বারা পেয়ারা কাটিয়া নিজে খাইতে লাগিলেন এবং অন্যদেরও দিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে মুসলমান দু'টি গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। তখন বাবাজী মহারাজ কহিলেন—"এরা মনে করেছিল আমি ওদের ভয়ে আসন ছেড়ে দিব। আমার গায়ে ত আর জোর কিছু কম নহে, কাজেই আমি ওদের ভয় কর্‌বো কেন? আমি একাই ওদের দু'জনের সঙ্গে শক্তিতে কম নহি।" তাতো ঠিকই—শক্তি যার আছে, সে অন্যকে ভয় কর্‌বে কেন? শক্তিহীনের ধর্ম্মই বা কি করিয়া হয়?

শ্রীযুত গোস্বামী প্রভু যেবার প্রথম শ্রীবৃন্দাবনে যান, সেবার প্রায়ই তিনি বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে যাইতেন; কিন্তু বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি মুখে কোন কথা বলিতেন না,—চুপ-চাপ বসিয়া থাকিতেন। শ্রীযুত অভয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বাবাজী মহারাজের নিকটে যান, অথচ কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে চুপ-চাপ ব'সে থাকেন কেন?" গোস্বামী প্রভু—"বাহিরে চুপ ক'রে বসে থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়ে থাকে।" শ্রীযুত অভয় বাবু—"সে কিরূপ?" গোস্বামী প্রভু—"আপনারা যেমন মুখে একজনের সঙ্গে কথা বলেন,—আমরাও তেমনি অন্তরে অন্তরে দু'জনে কথা বলি। আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রশ্ন করি,—তিনি আমার অন্তরে সে প্রশ্নের উত্তর দেন।" মহাপুরুষদের সকলই নূতন রকমের—কথা বলার রীতিও অন্যরূপ।

ভক্তের আকুল প্রার্থনা ভগবান কত ভাবেই না পূরণ করেন। ঢাকায় এক ডাক্তার ছিলেন,—তাঁহার নাম যোগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। তাঁহার বাটীতে বাবাজী মহারাজের এক ফোটো ছিল। বাবাজী মহারাজ ঐ ফোটো হইতে বাহির হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন। তোমরা শুনিয়াছ—ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর হইতে ভগবান

বাহির হইয়াছিলেন—এও তাই আর কি ? একবার তাঁহার খুব অসুখ হয় ; তিনি ত মাছ মাংস খান না, কিন্তু খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে মাছ খাইতে ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজী নহেন। এই সময় একদিন বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন—“মাছ—আমি কখনও কখনও মাছের ভোগ পেয়ে থাকি, তুমি আমাকে মাছ ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতে পার—তাতে কোন দোষ নেই।” তিনি তখন বাবাজী মহারাজের আদেশ পাইয়া, মাছ ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন এবং সুস্থ হইলে পুনরায় মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শিষ্যের প্রয়োজনে—গুরুকে কত ভাবেই না বাঁধা পড়্‌তে হয় !

এগার

মৃত্যু বলিলে আমরা যাহা বুঝি সাধু মহাপুরুষদের মৃত্যু কিন্তু সেরূপ নয়; মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। কাপড় পুরাতন হইয়া—ছিঁড়িয়া গেলে—আমরা যেমন উহা ফেলিয়া দিয়া নূতন কাপড় গ্রহণ করি, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ তাঁহাদের রক্তমাংসের দেহটাকে—প্রয়োজন শেষ হইলে—আপন ইচ্ছায় ত্যাগ করেন। তাঁহাদের এই দেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা একেবারে লুপ্ত হইয়া যান না। নিজ ইচ্ছামত প্রয়োজনবোধে যে কোনরূপ দেহ ধারণ করিতে এবং যাকে ইচ্ছা দর্শন দান করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। কাজেই তাঁহাদের মৃত্যু আর সাধারণ লোকের মৃত্যু এক নহে। তাঁহাদের এই মৃত্যু বা দেহত্যাগকে এক রকম লীলা বলা যাইতে পারে।

১৩১৬ সাল ৮ই মাঘ শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ মানব-লীলা সংবরণ করেন। তিনি নরদেহ ত্যাগ করিলেন সত্য—সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এবং বলিতে গেলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? আজও যখন তিনি তাঁহার শিষ্যদের এবং অন্যান্য কাহাকেও

দেখা দেন, তখন কি করিয়া বলিব, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, তাঁহাদের এই মৃত্যু—সাধারণ ভাষায় মৃত্যু নহে—লীলা মাত্র।

১৩১৬ সাল, ৮ই মাঘ রাত্রিতে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তাঁহার ঘরে শুইয়া আছেন; সেই ঘরে তাঁহার একজন সেবকও ঘুমাইতেছিল, তাহার নাম রামফল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ জাগিলেন এবং রামফলের নিকট জল চাহিয়া লইয়া পান করিলেন; তারপর তাহাকে কহিলেন—"ভাই রামফল, তোর দেওয়া জল পান কর্‌লুম, তুই এখন শুয়ে পড়্—আমি এখন যাব।" রামফল তাঁহার এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে ঘুমাইয়া পড়িল। ইহার কিছু সময়ে পরে কাশীরাম নামক রসুইয়া এবং কাশীদাস নামক এক সাধু হঠাৎ জাগিয়া দেখেন সমস্ত আশ্রমটি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে ভরিয়া গিয়াছে। এইরূপে সমস্ত আশ্রমটি আলোয় আলোময় দেখিয়া তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং বাবাজী মহারাজের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহারাজ বিছানার উপর উপবিষ্ট—দেহ স্থির, নিষ্কম্প। তাঁহারা গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা; কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মতালু তখনও গরম আছে। প্রথমে কেউ কিছু বুঝিতে পারিল না; কেহ মনে করিল,

তিনি সমাধিস্থ আছেন; কেহ বলিল, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাত্রিশেষে দেখা গেল তাঁহার ব্রহ্মতালু যে গরম ছিল তাহাও ঠাণ্ডা হইয়াছে, কাজেই তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ৯ই মাঘ সকালে বহু সাধু ও ব্রজবাসী একত্রিত হইয়া, যমুনার তীরে লইয়া গিয়া সেই পূতদেহের সৎকার করিলেন।

কলিকাতায় শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট "টেলি" করিয়া তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি টেলি পাইয়া সেদিনই শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হইলেন এবং ১১ই মাঘ বৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছিলেন; কিন্তু আশ্রমের আর সেই পূর্ব্বের শোভা নাই। সর্ব্বত্রই এক বিষাদ-মলিন ভাব। বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতে আশ্রমের গাভীগুলি অশ্রুত্যাগ করিতেছে। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর মুখমণ্ডলদ্বয় এক ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে এবং শ্রীশ্রীরাধিকাজীর নয়ন হইতে অল্প অল্প অশ্রু ঝরিতেছে। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের দেহ যেখানে যমুনার তীরে সৎকার করা হইয়াছিল, তিনি সেখানে গেলেন—দেখিলেন, সেই স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে—যমুনাজী যেন হাত বাড়াইয়া তাঁহার বড় আদরের সন্তান, বাবাজী মহারাজের শ্মশানভূমিকে আপন বুকে টানিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক,

সেখান হইতে বাবাজী মহারাজের অস্থি খুঁজিয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিলেন।

সাধুদের মধ্যে কেহ দেহত্যাগ করিলে তের দিনের দিনে ভাণ্ডারা দেওয়া তাঁহাদের নিয়ম। এই ভাণ্ডারা অর্থ বৈষ্ণবদের ভোজন অর্থাৎ আমরা যেমন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লোকজন খাওয়াইয়া থাকি, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। ত্রয়োদশ দিবসে বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগ উপলক্ষে ভাণ্ডারা হইল। কি আশ্চর্য্য সেদিন হইতে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী ঠাকুরদ্বয়ের মুখমণ্ডল যে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা আর রহিল না। শ্রীশ্রীরাধিকাজীর নেত্র হইতে অশ্রুধারাবর্ষণও বন্ধ হইল; কিন্তু এই কয়দিন এইরূপ অশ্রু নির্গত হওয়ায় তাঁহার চোখের পুতুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগের প্রায় দু'মাস পূর্ব্বে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় শেষবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান। তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া যাওয়ার সময় বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন—"দেখ বাবা, আমার শরীর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কখন কি হয় ঠিক নাই। যখনই তোমাকে "টেলি" করা হ'বে, তখনই চ'লে আস্‌বে।" এই কথা শুনিয়া তিনি যারপরনাই দুঃখিত

হইয়া বলিলেন—"মহারাজজী, আপনি ব'লেছিলেন, আমি যে মন্দির তৈরী করছি তাতে যেয়ে আপনি বস্‌বেন এবং আমাকেও কাজকর্ম্ম ছাড়িয়ে এনে আপনার কাছে রাখ্‌বেন। কিন্তু এখন যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে সে কি ক'রে সম্ভব হবে?" বাবাজী মহারাজ—"না বাবা, আমার কথা কখনও মিথ্যে হ'বে না; তবুও আমি যা বল্লুম তা ভুলে যেয়ো না।"

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় এইবার বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগে ভাবনায় পড়িলেন; তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে তবেত বাবাজী মহারাজের কথা সত্য হইল না; কিন্তু কালক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ঐরূপ সন্দেহের কোনই মূল্য নাই—তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগের পূর্ব্বে হইতেই যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় ছয় বৎসর পরে সম্পূর্ণ হইল। এই মন্দির শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ যেখানে বাস করিতেন তাহারই নিকটে কেমারবনে অবস্থিত।

১৩২২ সাল ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পুরাতন আশ্রম হইতে

শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর বিগ্রহদ্বয় এই আশ্রমে আনা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মন্দিরের ঠিক উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইল। এই প্রকোষ্ঠের বাহিরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তাঁহার অস্থি সংরক্ষণ করতঃ তদুপরি তুলসীবেদী তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রজের বহু স্থান হইতে সাধু, মোহন্ত এবং ব্রজবাসী উপস্থিত হইয়া ঐ মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন। ইহার প্রায় চারি মাস পরে শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় সংসার-আশ্রম ত্যাগ করেন। প্রতি মাসে তিনি বহু টাকা রোজগার করিতেন; হাইকোর্টের বড় উকিল বলিয়া তাঁহার সম্মান বড় কম ছিল না। সেই সময় তাঁহার হাইকোর্টের জজ হওয়ার কথাও চলিতেছিল। কিন্তু তিনি সাংসারিক সমস্ত মান সম্মানই তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা আয়, বাড়ীঘর, সমস্তই ত্যাগ করিয়া ফকির সাজিলেন। সস্ত্রীক তিনি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমের নাম "নিম্বার্ক আশ্রম।" এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাবাজী মহারাজের সকল কথাই সত্য।

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের অন্যান্য শিষ্যেরা মিলিয়া শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়কেই মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময়

ঠাকুরজীর সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তদবধি তিনি এই আশ্রমেই বাস করিতেছেন।

১৩২৬ সালের ঝুলন-পূর্ণিমার দিন রাত্রে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়কে দর্শন দিলেন, এবং গীতার একটি শ্লোকের অর্দ্ধাংশ আবৃত্তি করিয়া এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, 'যাহা কিছু কর্‌বে তাহা তুমি নিজে কর্‌ছ ইহা মনে করো না; তোমার সকল কার্য্যের ভারই আমার উপর জান্‌বে।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। শ্লোকাংশটি এই :—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।"

অর্থাৎ যিনি যথার্থই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সকল রকম কার্য্য করিয়াও মনে করেন, তিনি কিছুই করেন নাই।

কি উদ্দেশ্যে বাবাজী মহারাজ সেদিন রাত্রিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া এই উপদেশ দান করেন, প্রথমে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু ঝুলন-পূর্ণিমার পরদিন প্রতিপদ তিথিতে অচিন্তিতভাবে ব্রজের অন্যান্য মোহন্তরা যখন তাঁহাকে ব্রজবিদেহী মোহন্ত পদে বরণ করিলেন তখন তিনি বাবাজী মহারাজের উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারিলেন। সেদিন সাধুমণ্ডলী তাঁহাকে শ্রীমৎস্বামী (১০৮) সন্তদাসজী নাম

শ্রীযুক্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজ (১০৬ পৃষ্ঠা)

প্রদান করিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন এবং অদ্যাবধি তিনি ঐ মোহন্ত পদেই আছেন। শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহ ধারণ করিয়া যে সকল স্থানে লীলা করিয়াছিলেন তাহার নাম ব্রজভূমি। এই ব্রজভূমি মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন এবং অন্যান্য স্থান লইয়া ৮৪ ক্রোশ অর্থাৎ ১৬৮ মাইল। ব্রজবিদেহী মোহন্তপদ যিনি লাভ করেন, তিনি ৮৪ ক্রোশ ব্রজধামের সাধুমণ্ডলীর কর্ত্তাস্বরূপ হন।

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে কত ঘটনা রহিয়াছে—কত কথাই বলা যাইতে পারে; আবার সকল বলাও সম্ভব নয়। যাহা হউক, আর দু' একটি ঘটনা বলিয়া, এইবার আমরা তাঁহার অদ্ভুত জীবন-কথা সমাপ্ত করিব।

শ্রীবৃন্দাবনে বাংলাদেশের ন্যায় পুকুর নাই; প্রায় সর্ব্বত্রই কূপের জল ব্যবহৃত হয়; কিন্তু অধিকাংশ কূপের জলই লোণা। একবার শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়কে দর্শন দেন এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থিত নিম্বার্কাশ্রমের একটি স্থান দেখাইয়া দিয়া বলেন—"এই স্থানে কূপ খনন কর, তা হ'লে ভাল জল পাবে।" কলিকাতায় থাকিয়া কি করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কূপের স্থান দেখিতে পাইলেন, এই প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠিতে পারে; কিন্তু মহাপুরুষেরা ইচ্ছা করিলে সকলই সম্ভব হয়।

কাজেই শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের কৃপায়ই ইহাও সম্ভব হইল। যাহা হউক ঐ স্থানে কূপ খনন করিলে খুব ভাল জল পাওয়া গেল।

শ্রীযুত ক্ষীবোদ সেন নামক এক কবিরাজ কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ী ফরিদপুর; তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ প্রত্যহ খুব নিষ্ঠার সহিত শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের ফোটো পূজা করিতেন। একদিন হঠাৎ বাবাজী মহারাজ সেই ফোটোতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ অবশ্য সেই সময় জীবিতই ছিলেন—তবুও এইরূপে দীক্ষাদান বড়ই আশ্চর্য্য নয় কি? এইরূপ কত লীলাই তিনি করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও কখন কখন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম নিম্বার্ক সম্প্রদায়। তিনি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব নাম "হংস" সম্প্রদায় এবং "সন্" সম্প্রদায়। পরে কি করিয়া ইহার নাম নিম্বার্ক সম্প্রদায় হইল, তাহাই এইবার তোমাদের বলিব।

দেবর্ষি নারদের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রী (১০৮) নিয়মানন্দ স্বামী। একবার তাঁহার আশ্রমে

বহু যতি অতিথিরূপে উপস্থিত হন। তিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন—যোগবলে যতিগণের খাবার যোগাড় করিলেন। তখন বেলা অবসানপ্রায়। যতিগণ কহিলেন—"সূর্য্যাস্তের পরে আমরা আহার করি না।" এই কথা শুনিয়া নিয়মানন্দ স্বামী যাহা করিলেন তাহা বড়ই অদ্ভুত। তাঁহার আশ্রমে একটি বৃহৎ নিম গাছ ছিল, তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন, এবং যোগবলে শ্রীভগবানের সুদর্শন-চক্র আনয়ন করিয়া গাছের উপরে আকাশে স্থাপন করিলেন। সেই চক্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ ঢাকিয়া ফেলিল এবং সূর্য্যের মত উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। তখন যতিগণ আহার করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আহারের পরই যখন সুদর্শন-চক্র আর সেখানে রহিল না—তখন দেখা গেল, রাত্রি অনেক হইয়াছে। এই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম নিম্বাদিত্য হইল। নিমগাছের উপর অর্ক (সূর্য্য) কে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম নিম্বার্ক হয়, এবং তদনুসারেই এই সম্প্রদায়ের নাম "নিম্বার্ক সম্প্রদায়"।

এই সম্প্রদায় বিষ্ণু উপাসক। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি ইহারা পূজা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপক। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া যিনি আছেন তিনিই বিষ্ণু। আমরা আশে পাশে চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখি এবং যাহা

কিছু দেখিতে পাই না সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত। তাই শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের একটী বিশেষ উপদেশ, প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি আছেন, এইরূপ মনে করিয়া সেবা করিলে কল্যাণ লাভ করা যায়।

এই জগৎ কর্ম্মময়। কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না ; কাজেই কর্ম্ম আমাদের করিতেই হইবে। তোমরা গীতার নাম শুনিয়াছ। ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীভগবান, তাঁহার প্রিয় শিষ্য বীরবর অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে লিখিত আছে। এই গ্রন্থে অনেক রকম উপদেশ আছে এবং একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাও যে মানুষ ভগবান লাভ করিতে পারে তাহারও উপদেশ রহিয়াছে। আমি তাঁর দাস, তাঁরই জীবের সেবা করিতেছি, এই বুদ্ধিতে কাজ করিলে সংসারের সকল মায়ার বন্ধনই এককালে ছুটিয়া যায়। আমরা যে যে অবস্থায় আছি এবং যেরূপ কর্ম্মের উপযুক্ত, তদনুসারেই যদি কর্ম্ম করিয়া যাই, এবং সেই কর্ম্ম তাঁহার সেবা বলিয়া মনে করিতে পারি, তবে তাহাতেই আমাদের মুক্তি অর্থাৎ ভগবান লাভ হইতে পারে। এইরূপে কর্ম্ম করাকে শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে গুরু চাই ; আবার বলিতেছি, এই কর্ম্মযোগ শিক্ষা করিতে হইলেও উপযুক্ত গুরুর

প্রয়োজন। যদি তোমরা তোমাদের জীবন—এই মানব জীবন সার্থক করিতে চাও, তবে উপযুক্ত গুরু খুঁজিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর, এবং তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে জীবন-পথে অগ্রসর হও।

যাঁহার জীবনের পুণ্য-কাহিনী আজ তোমাদের বলিলাম, যুগে যুগে এইরূপ কত মহাপুরুষই না ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পদরেণু বহন করিয়াই ভারত-ভূমি জগতের তীর্থভূমি।

ওঁ শান্তি।